শচীন দাশ

করুণা প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৮ জুলাই ১৯৬২।

প্রকাশক :
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮ এ, টেমার লেন
কলকাতা—৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : সব্রত মাজী

অক্ষর বিন্যাস
রেজ ডট কম
৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
শিবদুর্গা প্রেস
৩০বি, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

কথাকার
নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
প্রিয়বরেষু

অগ্রহায়ণের বেলা শেষ হয়ে এল। পীচঢালা কালো রাস্তার দুধারে এখনও ছাড়া ছাড়া মানুষজন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে ধান তোলায় ব্যস্ত। দিন কয়েক আগে থেকেই কাটা শুরু হয়েছিল। কেটে কেটে স্তূপ করে রাখা হচ্ছিল মাঠের এখানে ওখানে। নাড়া বেঁধে বেঁধে সেই স্তূপই আবার উঠে যাচ্ছে এখন বাঁকের দুধারে চেপে। ছোটোখাটো ও মাঝারি বয়সের কামলা ছাড়া মাঠে তাই আর অন্য কোনো জনপ্রাণীও নেই।

ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে হেঁটে আসছিল রাশেদ। কী ভেবে একবার থমকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে একসময় আবার তাকাল সে আকাশের দিকে।

আকাশ এখনও ঘন নীল। নির্মেঘ। শেষ ভাদ্রের বর্ষা তার রেশটুকু আশ্বিনের প্রথমে এনে ঢাললেও কার্তিক মাস পড়তে না পড়তে সেই যে শুরু হয়েছে ঋতুবদলের পালা এখনও তা সেভাবেই চলছে। উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে ঢুকে পড়েছে কনকনে ঠাণ্ডা। এরই পাশাপাশি বেলা গড়াতে না গড়াতে মাইলের পর মাইল জুড়ে আশ্চর্য এক কুয়াশা। এমন যে দুহাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না তখন ভালো করে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল রাশেদ। চোখ নামিয়ে এবারে আবার হাঁটতে শুরু করল।

সে আসছে দু-তিনটে গ্রাম পেরিয়ে এখন। যাবে আরও একটা গ্রাম উজিয়ে। আরও খানিকটা দক্ষিণে।

দক্ষিণে আর সামান্য এগোলেই একটা খাল পড়বে। আর খাল বরাবর রেল-লাইন। ওই লাইনের পর থেকেই শুরু হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া। ওই বেড়ার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাঠঘাট পার হয়ে বাংলা-হিলিতে পৌঁছোনো যায়। কিন্তু ওদিকে এখন আর যাবে না রাশেদ। গেলে বিডিআর ও বিএসএফের খপ্পরে পড়ারই সম্ভাবনা। বিএসএফগুলোর যা কড়া নজর। দেখলেই কী করে যেন ধরে ফেলে। এই তো দিন পনের আগে যেভাবে ওকে ধরে ফেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল রাতের অন্ধকারে তাতে হয়তো বা মনে রাখলেও রাখতে পারে। কাজেই ওদিকে না গিয়ে খাল পেরিয়ে মনোহরপুরে ওঠাই ভালো।

ছোটোখাটো একটা জায়গা এই মনোহরপুর। অখ্যাত এক গ্রাম। বলার মতো বিশেষ কিছুই নেই। শুধু জনা পঞ্চাশেক ঘর রয়েছে ছিটকে-ছাটকে এদিকে

ওদিকে। জীবিকা বলতে ওই চাষবাস। ধান-তামাক ও লঙ্কা। একবার বিডিআরের তাড়া খেয়ে ওই গ্রাম দিয়েই ইন্ডিয়ায় ঢুকেছিল রাশেদ। কাজেই রাস্তা একরকম জানাই আছে। না-চেনারও কথা নয়। রাশেদ এগোল।

দুপুর গড়িয়েছে অনেকক্ষণ। গড়ালেও রাস্তার পশ্চিমপাড়ে তামাকের খেতে ছায়া নামেনি এখনও। তবে শীতঋতুর সূর্য, এই আছে কি এই নেই ভাবতে ভাবতে রাশেদ আর দেরি করেনি। দুপুরের আগেই বেরিয়ে পড়েছিল। বেরিয়েছিল নালুয়াহাট থেকে। বেরিয়ে তামাকের খেতের পাশ দিয়েই পা ফেলেছিল দ্রুত। দ্রুত না ফেললে সে জানে, আর খানিকবাদেই এদিকে শুরু হয়ে যাবে কুয়াশার উৎসব। আর সে উৎসবে একবার জড়িয়ে পড়লে আর পৌঁছুতে হবে না তাকে। বরং ওখানে পৌঁছুবার পরে কুয়াশা নামলে তারই সুবিধে। নিঃশব্দে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকে পড়তে পারবে। মনোহরপুর সীমান্তে লোকজন বেশি নেই বলেই বিএসএফের টহলদারিও যেন হালকা।

রাশেদ পা বাড়ায়। হাঁটতে হাঁটতে আবারও চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

আশেপাশে মাঠের এখানে-ওখানে এখনও থোকা থোকা মানুষজন। অদূরে পাকা রাস্তায় মাঝে মধ্যে দু একটা মাইক্রোবাস। কখনো-কখনো বা একটা দুটো দলছুট পাখি। রাশেদের মাথার ওপর দিয়ে ক্রি ক্রি করে উড়ে যাচ্ছিল। উড়েই আবারও ঘুরে এসে দলের ঝাঁকে মিশে যাচ্ছে।

এসময়ে এদিকে মাঠপাখি আসে প্রচুর। ফিঙে-কসাই-সুঁই চোরা-মাঠ-চড়াই-পিপিট-আরাবিল ও মেঠো কাঠঠোকরা থেকে গো-বক আর টিয়া পর্যন্ত কতই না পাখি। ধানকাটার পর ছড়ানো ধানের সন্ধানে ঘোরে। ঘুরতে ঘুরতে কখন যে আবার উড়েও যায়। উড়ে এসে ঝপ করে বসে পড়ে আবারও কুচো ধানের সন্ধানে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চোখ রাখছিল রাশেদ। হঠাৎই এক জায়গায় এসে থমকে তাকায়। দিনের আলোটা যেন অনেকই কম এখানে। অনেকটাই কমে এসেছে। থমকে তাকিয়ে আকাশের দিকে আর একবার চোখ রাখে রাশেদ। আকাশটা পরীক্ষা করে। এই তো একটু আগেও কত রোদ ছিল। শেষ দুপুরের আলোটাও যেন খলবল করছিল আকাশের গায়ে। অথচ দু'পা এগোতে না এগোতেই এখানে এসে আচমকা ছায়া। হালকা একটা ছায়া যেন ঘনিয়ে এসেছে। তবে কি কুয়াশা নামতে শুরু করল! রাশেদ চিন্তায় পড়ে। সবে খালের কাছাকাছি এসে পৌঁছুছে সে। আর একটু হাঁটলেই খালপাড়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। খাল পার হয়েই এরপর মনোহরপুর। তা ওখানে ঢুকতে না ঢুকতেই যদি কুয়াশা নেমে যায়?

ভাবতে গিয়েই চঞ্চল এখন রাশেদ। ভয়ও পেল। যেভাবেই হোক কুয়াশা পড়ার আগেই তাকে ঢুকতে হবে মনোহরপুরে। এরপর বিডিআরের চোখ এড়িয়ে গাঁয়ের ভেতরেই কোথায়ও গা ঢাকা দিয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। তারপর কুয়াশার খেলা শুরু হতেই সে এগোবে কাঁটাতারের বেড়ার দিকে। না এগিয়ে উপায় কী! একবার যখন খোঁজ পড়েছে বিডিআর কি ছাড়বে তাকে? সেবারের মতো চিরুণী তল্লাশে ঠিক ধরে ফেলবে ওদের জালে। তারপর এক ধাক্কায় আবার সীমান্তের ওপারে।

আল ধরে ধরে আবারও হাঁটা শুরু করল রাশেদ। কিন্তু চটি পায়ে দ্রুত হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে দেখে একটু গিয়েই সে রবারের চটিজোড়া খুলে নেয়। নিয়েই হাতের থলেতে ভরে। এই একটা থলে ছাড়া বিশ্বসংসারে আর কিছুই নেই রাশেদের। বিশাল এই পৃথিবীতে সে একেবারেই একা। বাপ-মায়ের কথা তার একেবারেই মনে পড়ে না। শৈশবে চোখ মেলে দেখেছিল শুধু এক নানিকে। মাথায় জট পাকানো পাটের ফেঁসোর মতো কিছু আলুথালু চুল, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়া আর শুকনো হরিতকির মতো দুই স্তনের মাঝে ময়লা একটা কাপড় পাকানো। পাকিয়ে আড়াআড়িভাবে ফেলা।

এই পৃথিবীতে রাশেদের যেমন কেউ নেই, তেমনি নানিও ছিল একা। শুধু তাই-ই নয়, তার না-ছিল ভিটে না-ছিল কোনো চাল। ঘুটে কুড়োনি বুড়ির মতো ঘুরতে ঘুরতে যেখানে যখন ঠাঁই মিলত ওই ওখানেই রাশেদকে নিয়ে যেত। কাঁখালে কাঁখালে জড়িয়ে রাখত। রেখে কত যে কথা, কত গল্প। এমনি গল্পে গল্পে রাশেদ যখন একটু বড় তখন সে জিজ্ঞেস করেছে একদিন নানিকে। জানতে চেয়েছে তার বাপের কথা। কিন্তু নানি বলেনি প্রথমে। বলতে চায়নি সেভাবে কিছু। তবে তার মায়ের কথা জানিয়েছে। বলেছে তাকে তার মায়ের বেত্তান্ত।

রাশেদের অল্প অল্প মনে পড়ে। এক দুপুরে সে যখন বিলের পাড়ে, ইজের খুলে রেখে ন্যাংটো হয়ে পানকৌড়িদের সঙ্গে সাঁতারে মেতেছে, আর বিলে ছায়া পড়েছে বাদলের মেঘের, ছায়া ঘন হয়ে এসেছে বিলের পাড় থেকে ঝুঁকে পড়া বট-পাকুড় আর তাল-তমালের পাতায়, ওই তখনই জলের ভেতরে যেন বড় একখানা মুখ। মাথাখানা কাতলা মাছের মতো, তাতে ঝাঁকড়া চুল, আর সে চুলের নীচেই কপালের তলায় এক জোড়া রাঙচিতার পাতার মতো দীঘল চোখ।

তবু যেন লক্ষ করেনি রাশেদ। সাঁতারেই মেতে উঠেছিল জলের ভেতরে। কখনও দু-হাতে জল কেটে কেটে কখনও-বা পা দিয়ে দিয়ে জল ভেঙেই

জল তোলপাড় করছিল, এই সময়েই কার কণ্ঠ।

রাশেদ নি?

হ। চমকে উঠেছিল রাশেদ। ভয়ে ভয়েই এরপর যেন সাড়াটা দিয়েছিল, আমি রাশেইদা—

এই বিলে লামছস ক্যান?

বাহ্, সাতরামু না—

রাশেদ বলে আবারও ভয়ে ভয়ে।

কিন্তু বিলখান ভালা না। দাম-শ্যাওলার বড়া জালি আছে। পা-ও একবার জড়াইয়া ধরলে আর ঘেডি তোলনেরও সময় পাবি না—

তয় হেইগুলি যে ডুব মারে আর ওঠে...

কোনগুলি!

ওই যে পানকাউয়ার দল—

রাশেদ জিজ্ঞেস করেছিল মুখটা তুলে। কিন্তু বলতেই সে হাসে।

আরে হোনো পোলার কথা। হেইগুলি তো পানিতেও বাচে আবার ডেঙায়ও বাচে। তুই নি বাচস পানিতে। নে বাপ, উইঠ্যা পড়...বাপের বাক্যি হোনন লাগে।

বাপ! বাপ আইল কই থিকা! রাশেদ অবাক, আমার কুনো বাপ নাই—

এই দেহ, বাপ না থাকলে তুই আইলি ক্যামনে! তর মায়রে গিয়া জিগা দেহি?

ক্যামনে জিগামু। মায় থাকলে তো জিগামু! রাশেদের চোখ ছলছল করে ওঠে।

মানুষটি শুধোয়, ক্যান, কই গেছে?

চান্দের দ্যাশে। নানি কইছে—

নানি! কোন নানি? তর নানির তো ইন্তেকাল ঘটছে। তুই তারে দেখস নাই।

ধুর! মিছা কথা। রাশেদ ডুব মারে, ওই হোনো ...হুনছ... নানি ডাকতে আছে চিক্কইড় পাইড়্যা—

বলতে বলতেই জল থেকে ভুস করে মাথা তোলে রাশেদ। আর তুলতেই দেখে বিলের পাড়ে হিজল গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে নানি। মুখে তার নাম ধরে চিক্কইর।

রাশেদ ভয়ে ভয়ে উঠে পড়ে। কিন্তু পাড়ে উঠলে আর ভয় থাকে না। তবুও তাকায় সে জলের দিকে। এরপর ইজেরটা তুলে নিয়ে কোনোরকমে

জলে ভেজা শরীরে ইজেরটা গলিয়েই নানির কোলে ঝুপ। নানির ময়লা ও দুর্গন্ধওয়ালা শুকনো কাপড়ে মাথা মুছতে মুছতেই এরপর প্রশ্ন। জিজ্ঞেস করে নানিকে।

নানি, আমার বাপ আছিল নিকি?

হ আছিল তো—

নানি হাসে।

আছিল! কই আগে তো হুনি নাই?

কোল ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে রাশেদ। নানি বলে,

হুনবি কি, তর হোননের বয়স আছিল তহন!

বলতে গিয়েই নানি শোনায় তার বাপের গল্প। ফলে বাপের পাশাপাশি মায়ের কথাও এসে যায়। মাকে নিয়ে, মার সম্পর্কে জানায় আরও অজানা তথ্য।

বাপ ছিল তার মুক্তিযোদ্ধা। তা সেই মুক্তিযোদ্ধা বাপকে মেরে ফেলে এক বিকেলে গ্রামে ঢোকে হানাদার বাহিনী। সঙ্গে দু'তিনজন রাজাকার। ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির পর বাড়িতে ঢুকে লুটপাট চালায়। যুবতী মেয়েদের ধরে ধরে নিয়ে যায়। এমনি ধরে নিয়ে যাবার পথে হঠাৎই চোখে পড়ে যায় রাশেদের মা মায়মুনকে। মায়মুন তখন প্রকৃতির ডাকে জল ছাড়তে পুকুরের পাড়ে গিয়েছিল। আচমকা নজরে পড়ে এক রাজাকারের। মায়মুনের ছোটোখাটো ছিপছিপে শরীরটাকে মুহূর্তেই পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে আসে ওই রাজাকার। তারপর জিপে তুলে নিয়ে সোজা হানাদারদের ক্যাম্পে। হানাদারদের কোলে কোলেই নিষ্পেষিত হয়েছিল এরপর। ফলে ফেরা আর হয়নি মায়মুনের। মায়মুন আর ফিরে আসেনি। তবে পরের দিন কচি একটা গলার চিৎকার টের পেয়েই নানি গিয়ে আবিষ্কার করে রাশেদকে। তখন তার কতই বা বয়স! বোধহয় মাস তিনেকই হবে। দাওয়ার এক কোণে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে ঠাঁইঠাঁই করে চেল্লাচ্ছে রাশেদ।

শুনতে শুনতে চোখে জল এসে গিয়েছিল। মুহূর্তেই কচি মুখটা যেন নাইকলের মতো কঠিন। চোখজোড়া জ্বলে ওঠে।

ওই রাজাকারগুলি কই থাকে নানি? রাশেদ শুধোয়, বিলের পানিতে!

এই দেহ, পানিতে থাকব ক্যান। ডেঙায় আছে—

তয় বাজানে ক্যান বিলের পানিতে ঘোরে?

বাজানে ঘোরে? কী কস তুই!

হ নানি। আমারে যে ডাকল রাশেদ কইয়া—

নানি ভয়ে জড়িয়ে ধরে রাশেদকে। রাশেদ তখন শুধোয়, আমার বাজানরে দেখছ তুমি নানি?

হ দেখুম না ক্যান। গায়ের পোলা। গায়ে থাইক্যাই ধিকধিকাইয়া বড় অইল—

বলতে গিয়েই নানি চুপ। হঠাৎই তার কী মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে সেই চেহারাটা। ছ'ফুট লম্বা ছিপছিপে এক তরুণ। চওড়া বুক। শ্যামলা রঙ। নাকটা একটু উঁচুর দিকে। নাম আমিরুল। হা-ডু-ডু খেলায় একবার নামলেই হল। আর যেন হারাতেই পারবে না কেউ তাকে। পারতও না। এছাড়া ওর হাতের থাপ্পড়। চওড়া পাঞ্জার থাপ্পড়টা যদি একবার কারও গালে পড়ল তো তার দু'চোখে অন্ধকার। তা সেই ছেলেই গেল একদিন মুক্তিযুদ্ধে। ঘরে রইল তার মা আর বউ। আর বউয়ের প্যাটের ছাওয়াল একটা।

মুক্তিযুদ্ধের আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে। ট্রেনিং নিয়েছিল যুদ্ধের। যেমন থ্রি-নট-থ্রি চালাতে পারত তেমনি গ্রেনেড ছোঁড়াতেও সমান দক্ষ ছিল সে। তার ছোঁড়া গ্রেনেড কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। কিন্তু তবুও বুঝি লক্ষ্য হারাল সে। এক রাতে হানাদারবাহিনীর ক্যাম্পে হানা দিয়ে দশ দশজন খানসেনাকে মারল। কিন্তু মারলেও সে আর ফিরে আসেনি। গুলিতে গুলিতে দেহটা ঝাঁঝরা করে দিয়েও রোষ মেটেনি হানাদারবাহিনীর। মৃত লাশটা নিয়ে মিছিল করেছিল। জিপে করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়ে নিয়ে তারপর তাতে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এই খবরে সেদিনই মারা যায় আমিরুলের মা। পুত্রশোক আর সহ্য করতে পারেনি। আর এর পরে পরেই একদিন ভূমিষ্ঠ হয় রাশেদ।

শুনছিল রাশেদ। একসময় শুধোয়, মাইরা ফালাইলে বাপে আর ঘোরে ক্যান নানি? বাপের মোখখান কী বড়... এই একখান কাতল মাছের লাখান—

নানি শিউরে ওঠে, নানা তুই আর বিলে যাইস না কইলাম। ওই বিলে জিন আছে। পা-ও জড়াইয়া ধরব কইলাম।

হ বাপেও তাই সাবধান কইর‍্যা দিছে। রাশেদ জানায় বিড়বিড় করে, কইছে বিলে য্যান না লামি—

কইছে!

হ, নানি—

নানির চোখে বিস্ময়। নেত্রনালি থেকে জল গড়িয়ে নামে। আর জল দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রাশেদ।

এইয়া কী! তোমার চউখে পানি দেহি নানি—

রাশেদ তার কচি আঙুল তুলে নানির তোবড়ানো গাল থেকে জল মুছে নেয়। নানি ওকে জড়িয়ে ধরে। জড়িয়ে কী ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না। 'সেই আইলি তয় বয়স্যকালে আইনি না ক্যান! অহন আমি তরে কী খাওয়াই কী পরাই....'

রাশেদ চুপ। নানি যে কী বলে কিছুই বোঝে না সে। চুপচাপ তাই নানির কোলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে।

এই ঘটনার পর দুদিনও যায় না, এক সকালে ঘুম থেকে উঠে রাশেদ দেখে, নানির দেহটা পানিতে ভেজা কাঠের গুঁড়ির মতোই ঠাণ্ডা। ডাকলেও সাড়া দেয় না।

কেন সাড়া দিল না, সেদিন আর বোঝেনি রাশেদ। বুঝল অবশ্য অনেক পরে। ততদিনে ঘাড়ে গর্দানে রাশেদ বেড়েছে তার বাজানের মতোই। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। আর ভারী একখানা পেশীবহুল কাঁধ। আর সে কাঁধের ওপরেই যেন নবীন মেঘের মতো এক গুচ্ছ বাবরি চুল। কিন্তু ঘর নেই বাড়ি নেই, মাথার ওপরে শুধু খোলামেলা আকাশ একখানা। রাশেদের মনে পড়ে, মরার আগে নানি যেন বলেছিল একদিন, দ্যাখ—দেইখ্যা ল। এই ভিটা এই চালা আর ওই বিলখান তর। তর বাপ-ঠাকুদ্দা এইহানে কাটাইয়া গেছে। এই ভিটা তুই ছাড়িস না কিলাম—

ঠিকঠাক বোঝেনি সেদিন রাশেদ। আর বুঝবেই বা কী! মাত্র বছর পাঁচেকের গ্যাদা বাচ্চা একটা। ফলে না বুঝলেও মাথাটা নেড়েছিল। কিন্তু নাড়লে কী হয়, নানি গেল সঙ্গে সঙ্গে সে-ও একদিন চালার বাইরে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে। ঘুরে মরেছে খিদের জন্য। এ-পেটে তার বড়ো খিদে। ফলে খিদের জন্য হাত পাততে সে শুরু করল। আর হাত পাততে পাততে কোথায় না গেছে! গাঁ গঞ্জ থেকে শহর, শহরের বাসস্ট্যান্ড থেকে আবার স্টিমারঘাটা। খিদের জন্যই শুধু ঘুরেছে। ঘুরতে ঘুরতে আবার এর তার কাজও করেছে। মুটে-মজুরের কাজ থেকে মুনিস-মাইন্দারের কাজ, যখন যেমনটা পেয়েছে। আর সে কাজেই ভিটে ছেড়ে গাঁ ছেড়ে দেশ ছেড়ে কোথায় কোথায় না গেছে। এবং এভাবেই কত না দিন, কত বছর। ঘুরতে ঘুরতে, হাটে-মাঠে বড় হতে হতে সেই ভিটের কথা আর মনেই নেই রাশেদের। মনে যখন পড়ল, তখন তার অনেকটা বয়স। গাঁয়ের কথাটা যেমন ভুলে গেছে, তেমনি নামটাও আর মনে করতে পারেনি। কী যেন বলেছিল নানি! কী যেন শুনিয়েছিল! কী বলেছিল তা আর মনে নেই এখন। তবে মনে করার চেষ্টায় ঘুরেছে সে অনেক জায়গায়ই। কখনও নদীর পাড়ে, কখনও হাটের চালার নীচে, আবার কখনও বা কোনো গাছের তলায়। আর এভাবেই জীবনের তিরিশটা বছর আনেবানে কেটেছে তার। কত

খুঁজেছে, ভিটেমাটির খোঁজখবর তবুও পায়নি।

রাশেদ তাকায়। ভাবতে ভাবতে কখন যে পুরোনো কথায় ফিরে গিয়েছিল খেয়াল নেই রাশেদের। খেয়াল হল হঠাৎই খালপাড়ে এসে দাঁড়াতে। আর দাঁড়াতেই যেন ধাঁধাঁ লেগে গেল চোখে। খালের নিস্তরঙ্গ জলের ওপরে চাপ বেঁধে নেমে এসেছে কুয়াশা। আশে পাশে মাঠের এদিকে ওদিকেও ধোঁয়ার মতো তা উড়ে আসছে অসংখ্য হিমকণা নিয়ে। তার মানে আর দেরি নেই। রাশেদ বুঝল, এখুনি তাকে খাল পার হয়ে যেতে হবে। এরপর খানিকটা হেঁটে গিয়ে মনোহরপুর গ্রাম।

এপাশে ওপাশে তাকাল রাশেদ। এ খালে যেন ডিঙি ছিল আগে একটা! রাশেদ ঠিক মনে করতে পারল না। তবে একটু এগিয়ে এদিকে ওদিকে চোখ রাখতেই আবিষ্কার করল একটা বাঁশের সাঁকো। খালের এপারে-ওপারে বড়-বাঁশ ফেলে সরু একটা পায়ে চলা সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। রাশেদ আর দেরি করে না। ক্ষিপ্র পায়ে প্রায় নিঃশব্দেই সে গিয়ে ওঠে সাঁকোতে। তারপর দু'তিন মিনিটেই একদম ওপারে।

ওপারে পৌঁছেই জোরে জোরে পা চালায় রাশেদ। তখন তার বুক থেকে ঘন ঘন নিঃশ্বাসও পড়ছে। আর একটু, আর একটু হাঁটলেই মনোহরপুরে পৌঁছে যাবে সে। রাশেদ চোখ তোলে আকাশের দিকে।

এখন আর আকাশে তেমন আলো নেই। না থাকলেও পথঘাট যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনোহরপুরে সে পৌঁছে যাবে নিশ্চিত। কিন্তু যেভাবে কুয়াশা নামছে তাতে আবার সন্দেহও হচ্ছে ওর। যেতে পারবে তো শেষ পর্যন্ত! খালপাড় ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে মাঠেই সে নেমে পড়ে একসময়।

এদিকে আর লোকজন তেমন নেই বললেই চলে। তবুও আশেপাশে দু একজন করে মুনিস। মাঠে দাঁড়িয়ে ধানের নাড়া তোলায় ব্যস্ত। মাঠ ছেড়ে একটু পরেই আলের ওপরে উঠে পড়ল সে। উঠেই কাটা ও আগাছার ঝোপ ডিঙিয়ে লম্বা পায়েই সে মাঠ ভাঙতে থাকল। এভাবে আড়াআড়িভাবে মাঠ ভাঙলে আর একটু পরেই সে পৌঁছে যাবে। উৎসাহে রাশেদ যেন ছুটতেই শুরু করে।

কিন্তু একটু গেছে কি যায়নি, এই সময়েই আচমকা একটা ভারী গলার আওয়াজ।

থামো! থামন লাগে। কে ওহানে?

রাশেদ চমকে উঠল। আর ওই তখনই চোখে পড়ল, ঝাপসা কুয়াশায় ঢাকা

অদূরে লম্বা একটা কাঁটাতারের বেড়া। আর তারই পাশে দাঁড়িয়ে দুই রাইফেলধারী। সঙিন উঁচিয়ে যেন রাশেদকেই তাক করে দাঁড়িয়েছে এখন।

দুই

বিডিআর দুজন এগিয়ে এসেছিল। এগিয়ে রাশেদের আগাপাছতলা দেখল। দেখতে দেখতেই একসময় শুধোল।

নাম কী!

রাশেদ।

রাশেদ কী?

রাশেদ রহমান।

হেই দিকে যাওন অইতে আছিল কই?

মনোহরপুর।

তা মনোহরপুরে ঢোকনের রাস্তা তো ভিন্ন। এই দিকে ক্যান?

রাশেদ থমকে যায়। নিজের ভেতরেই সে নিজে জড়িয়ে যায়। কথা আর খুঁজে পায় না যেন। ততক্ষণে এক বিডিআরের কপালে একটা সরু ভাঁজ। ভাঁজ পড়েছে অন্যজনের কপালেও। ভাঁজটা প্রসারিতও হতে শুরু করল এরপর।

আসা অইতে আছে কইত্থন? প্রথম বিডিআরের ঠোঁটের প্রশ্নটা কাটাকাটা।

রাশেদ চোখ তোলে, নালুয়াহাট। সন্তর্পণে জবাব দেয় রাশেদ।

কে আছে ঐহানে!

রাশেদ চুপ।

বিডিআরের সন্দেহ এবারে আরও ঘনীভূত। রাশেদের কাছে আরও খানিকটা এগিয়ে আসে। এগিয়েই মাথাটা নামিয়ে দেয়, হাচা কথা কইবা কিলাম। নিবাস অইল কই.... ইন্ডিয়ায়? চোখ ঝলসে ওঠে প্রথম বিডিআরটির।

না, বাংলাদ্যাশে।

বাংলাদ্যাশ! কোন জিলা? জিলা না উপ-জিলা?

বলাবাহুল্য রাশেদ চুপ। কী বলবে। গাঁয়ের নামটাই তো মনে নেই তার। কী যেন বলে ছিল নানি। কী বলেছিল তা তো ভুলেই গেছে কবে। ফলে উত্তর আর দিতে পারে না। না পেরে সে মনে মনে বিড়বিড় করে। আর ওই তখনই অন্য বিডিআরটির রাইফেলের কুঁদো তার পেছনে। একটু ঠেলা মেরেই বলল অন্যজনের দিকে তাকিয়ে, ক্যাম্পে লইয়া যাই....নাকি কও!

হেইয়াই ভালা—

অতঃপর রাইফেলের কুঁদোটি আবার রাশেদের পিঠে। চাপ দিল সামান্য, আউগাও দেহি সামনে—

কিন্তু এগোবে কী তার আগেই আগেরজনের নজরে পড়েছে রাশেদের থলেটা। আর পড়তেই সে থমকে দাঁড়িয়েছে আবার।

অই থইল্যায় আছে কী তুমার!

কথাটা রাশেদকে। কানে আসতেই নিজের অজান্তে থলেটা তাই চেপে ধরেছিল রাশেদ। নজরে পড়তেই বিডিআরের গলাটা শক্ত আরও এবারে, খোলো দেহি—

রাশেদ খোলে। খুলতেই বিডিআর একবার থলের ভেতরে উঁকি মারার চেষ্টা করে।

বাইর কর দেহি কী আছে?

রাশেদ থলেটা নিয়েই এবার মাঠের ওপরে বসে পড়ে। বসতেই তীব্র এক কামড়ানো ঠাণ্ডা। তার নাক ও কানের কাছে হু হু করে উড়ে আসা হিমগুড়ির স্পর্শ। এবং আলোও যেন নেই প্রায়।

থলে খুলে ভেতরের টুকিটাকি জিনিসগুলো বার করে রাশেদ। এক জোড়া চটি। একটা এনামেলের থালা। একটা তোবড়ানো গেলাস। পলিথিনের গাড়ু একটা। এছাড়া দুটো একটা ময়লা জামা-প্যান্ট, একটা লিলেনের চাদর ও পাতলা প্ল্যাস্টিকের ঠোঙায় কিছু মুড়ি। মুড়িটা প্ল্যাস্টিকে ভরে একটা সরু পাটের দড়ি দিয়ে বেঁধে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। দেখেটেকে বিডিআর দুজন যেন হতাশই হল একরকম। তবু শেষ একটা চেষ্টায় মরিয়া হয়ে প্রথমজন আবারও বলে ওঠে, বাস! আর কিছু নাই?

মাথা নাড়ে রাশেদ। নাড়তেই সেই বিডিআরের গলাটা আবারও ভেসে আসে, উল্টাও দেহি—

মুহূর্তেই থলেটা উল্টে দেয় রাশেদ। আর ওল্টাতেই থুপ করে একটা আলগা শব্দ। ন্যাকড়ার পুঁটলি একটা ছিটকে পড়ে। রাশেদ চমকে ওঠে। পুঁটলিটার কথা তার মনেই ছিল না। দেখতে পেয়েই ডান হাতটা বাড়িয়ে চট করে পুঁটলিটা তুলতে যায়। কিন্তু তুলতে আর পারে না। তার আগেই ওর বাড়ানো হাতটা পায়ের বুট দিয়ে আটকে দেয় বিডিআরের একজন। এবং এরপরেই রাইফেলের মাথাটা দিয়ে পুঁটলিটা সরিয়ে দেয়। সরিয়েই চটপট তুলে নেয় হাতে।

কী আছে রে? অন্যজন হাঁকে, কিয়ের পুডলি ওইডা—!

প্রথমজন জিজ্ঞেস করতেই দ্বিতীয়জন পুঁটলিটা খোলে। আর খুলতেই চোখ জোড়া স্থির।

ট্যাহা দেহ রাখছে কত পুড়লিটায়!

প্রথমজন অবাক, ট্যাহা!

হ, এই তো।

বলতে বলতেই দ্বিতীয়জনের চোখ জোড়া ঝিকিয়ে ওঠে, আরে এইয়া কী!

কী অইল? প্রথমজন ঝুঁকে পড়ে একটু নীচের দিকে।

ইন্ডিয়ার মানিও দেহি আছে এহানে—

ইন্ডিয়ার মানি! প্রথমজনের চোখ ঘোরে নীচের দিকে, দেখলা?

হ। এই দেহ—

বলে ইন্ডিয়ার নোট একটা তুলে দেখায়। দেখাতেই প্রথমজনের চোখ ফের রাশেদের দিকেই ঘুরে যায়, হাচা কথা কও নাই তাইলে!

না, না, হাচাই কইছি। বিশ্বাস যান—

বলতে গিয়েই রাশেদের নজরে পড়ে রাইফেলটা কাঁধে গলিয়ে দুহাতের মুঠোয় এখন পুঁটলির টাকাগুলো নাড়াচাড়া করছে দ্বিতীয় বিডিআরটি। রাশেদ হাত বাড়ায়, দ্যান—দিয়া দ্যান ওইডা—

রাশেদের কাতর অনুরোধ, দিয়া দ্যান—

কিন্তু দেবে কী, হাত বাড়ালেই লোকটি তার মুঠোটা ঘুরিয়ে নেয় ঝপ করে। রাশেদের বুক শুকিয়ে ওঠে। তার এত কষ্টের জমানো টাকা। গত একমাস ধরেই একটু একটু করে জমিয়েছে সে। কিন্তু যদি আর ফেরৎ না পাওয়া যায়। রাশেদ মরিয়া হয়ে ওঠে, দ্যান ট্যাহার জেবটা আমারে দ্যান। আমার কামাইয়ের ট্যাহা—

হেইয়া তো বোঝলাম। কিন্তু ইন্ডিয়ার মানি আইল ক্যামনে ইন্ডিয়ায় না গেলে?

কী করুম। রাশেদের মুখ কাঁচুমাচু, কাম নাই ওইহানে তাই গেছি। নইলে প্যাট চলব ক্যান?

রাশেদ আস্তে আস্তে বোঝাবার চেষ্টা করে।

তখন প্রথমজনের ঠোঁটে যেন হাসি খেলে যায়, হ তা যাইবা না ক্যান! পাশপোর্ট আছে যখন.... ভিসা বানাইছ যখন....যত খুশি যাও। দেহি তোমার পাশপোর্টখান?

আমার ওই হগল নাই। ভয়ে ভয়েই জানায় রাশেদ।

তয়! বিডিআরটির মুখে এবার জান্তব উল্লাস, গেলা ক্যামনে?

নীচু হয়ে ততক্ষণে থলের ভেতরের জিনিসগুলো আবার থলেতেই ভরে নিচ্ছিল রাশেদ। একসময় থলেটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, টাকার পুঁটলিটাকে গিঁট দিয়ে বেঁধে সেটা নিজের পকেটেই চালান করছে সেই

লোকটি। মুহূর্তেই কী যে ঘটে যায়। থলেটা এক হাতে রেখে অন্যহাতে পুঁটলিটা ছিনিয়ে নেবার জন্যই রাশেদ ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু পুঁটলিটা আর নিতে পারে না। ক্ষিপ্রহাতে সেটা পকেটে ঢুকিয়েই লোকটা এক ধাক্কায় তাকে নীচে ফেলে দেয়। দিতেই অন্য আর একজনের রাইফেলটা উঠে আসে তার বুকের কাছে।

ওঠ হালায়। এক্কারে ফাইড়্যা ফালামু। কেউ ট্যারও পাইব না। হালার ত্যাজ কত—

বলতে বলতেই নীচু হয়ে রাশেদের জামার কলারটা ধরে ওকে টেনে তোলে। এরপর ধাক্কাতে ধাক্কাতে সোজা নিয়ে যায় কাঁটাতারের বেড়ার দিকে। পরে একজন কাঁটাতারটা ফাঁক করে ধরতেই অন্যজন তাকে গলিয়ে দেয় সেই ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে। দিয়েই রাশেদের পাছায় এক বিপুল লাথি।

যা হালায়। ঢুইক্যা পড়। যা হান্দাইয়া খোন্দলে—

ততক্ষণে লাথিটা খেয়ে ঘাসের জঙ্গলেই ছিটকে পড়েছিল রাশেদ। এরপর দু'তিনটে পাক খেয়ে যখন উঠে দাঁড়িয়েছে তখন চারপাশে গাঢ় কুয়াশা। আবিষ্কার করল, পাকিয়ে পাকিয়ে হিমগুড়ি নিয়ে যেন তাকেই জড়িয়ে ধরছে। ফলে পেছনে ফিরে তাকিয়েও রাশেদের আর কিছু চোখে পড়ল না। না বিডিআর, না কাঁটাতারের সেই লম্বা বেড়া। তবে কানে এল তখনও সেই চাপা উল্লাস। বিডিআর একজনের উৎকট হাসি।

যা হালা, হান্দাইয়া যা। সামনে পঁচাশি পিলার। ওই পিলারখানের গা দিয়াই ঢুইক্যা পড়। যা কুয়াশ লাগছে বিএসএফের বাপের সাধ্য নাই তরে ধরে—

একটু পরে সেসবও আবার স্তব্ধ। কথা বন্ধ হয়ে যায়।

রাশেদ উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়াতেই কনকনে এক বাতাস নাকমুখ চিরে যেন বেরিয়ে যেতে শুরু করে। হাতড়ে হাতড়ে থলে থেকে লিলেনের চাদরটা বের করে আনে রাশেদ। তারপর মাথার ওপর দিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিতেই চোখজোড়া বুঝি ঝাপসা হয়ে আসে। তার অত কষ্টের ওই টাকা ক'টা! কান্নায় গলাটা বুজেই আসে রাশেদের। অন্ধকারে রাশেদ চোখের ওপরে একবার হাত রাখে। রেখে জলমোছার চেষ্টা করে।

এখন আর সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেবলই চাপচাপ কুয়াশা। আর কুয়াশার ভেতরে অন্ধকার। এর ভেতরে সে কোথায় যাবে? কোনদিকে! নাকি কুয়াশা না-সরা পর্যন্ত এখন এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে সারারাত! কিন্তু রাতভর এই ঠান্ডার ভেতরে কি আর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায়!

রাশেদ এগোবার চেষ্টা করে। আন্দাজে খানিকটা এগিয়েও যায়। কিন্তু পা

ফেলতে গিয়েও আবার থমকে দাঁড়ায়। সামনে কী আছে, ফাঁকা মাঠ না ধান কেটে নেওয়া দীর্ঘ প্রান্তর! নাকি সরষে অথবা তিল-চাষ দেওয়া কোনো খেত? নাকি কোনও জলাভূমি! না মাঠের ভেতরের কোনও লিকপথ। কিংবা নদী-খাতও হতে পারে। নদী শুকিয়ে গিয়ে হয়তো গতিপথ বদলেছে। আর বদলাবার সময়ই রেখে গেছে তার খাতটি। খাত হলে ঠিক আছে। হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলেও উঠে দাঁড়াতে পারবে সে। কিন্তু যদি বিল হয়? অথবা বাওর! আন্দাজে পা ফেলে ফেলে একটু একটু করে এগিয়ে যায় রাশেদ।

এখন সে যাবে কোনদিকে। ভেবে তো রেখেছিল, মনোহরপুর গ্রামের ওই জায়গা দিয়ে এমনি কুয়াশার ভেতরেই কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে সে ঢুকে পড়বে। তারপর এদিকওদিক করে সোজা বারসই। বারসইয়ে কাজের অভাব নেই। গিয়ে একবার দাঁড়ালেই হল। সেবারও তো এমনি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। আর দাঁড়াতেই কাজ একটা পেয়ে গিয়েছিল। পাথর তোলার কাজ। ঝুড়ি করে করে ভাঙা সাইজ করা পাথর এক জায়গা থেকে তুলে নিয়ে দাঁড়ানো দু তিনটি ট্রাকে ভরতে হবে। ভরছিলও তাই। কিন্তু গোলমালটা বাধাল ওই ঠিকাদার লোকটি। এক সকালে আরও অনেকের সঙ্গে ওকেও নিয়ে এল হিলি সীমান্তে। কাজ নাকি আছে একটা জরুরি। ব্রিজের কাজ।

আসলে নজরে পড়ে গিয়েছিল প্রথম থেকেই। আর যেখানেই কাজে লাগে সেখানেই সে এমনি নজরে পড়ে যায়। কেননা পরিশ্রমটা অমানুষিক করতে পারে রাশেদ। পশুর মতো খাটালে পশুর মতোই খাটে। পশুর মতো ওঠালে পশুর মতোই উঠে দাঁড়ায় সে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নজরে পড়ে যাওয়ার কথা। এবং পড়তেই প্রথম পছন্দের হয়ে উঠছিল। তখন আর ঠিকাদারেরা ছাড়ে না তাকে। যে যার মতো ব্যবহার করে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তুলে নিয়ে যায়। সেখান থেকে আবার ভিন্ন এক জায়গায়। এভাবেই চলছিল। কিন্তু একদিন আর চলল না। দুপুরের দিকে গাছতলায় বসে সে ভাত খাচ্ছিল। এই সময়েই ওই ঠিকাদার। সঙ্গে দু'চারজন সরকারি বাবু। হাতে ফাইলপত্র নিয়ে একটা জিপ থেকে নেমে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই হঠাৎ একে ওকে নানা প্রশ্ন। বাড়ি কোথায়, কোন গেরামে? বি পি এল কার্ড আছে কিনা! থাকলে দেখাতে হবে। কেননা সরকারি নির্দেশনামা বেরিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় পরিচয়পত্র চালু করা হবে। না হলে যে পরিমাণে অনুপ্রবেশ ঘটছে তাতে এ দেশেতেই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। ফলে বৈধকার্ডধারীরাই শুধু থাকবে বা থাকতে পারবে এসব এলাকায়।

ঠিকাদার তাদের আগেই শিখিয়ে রেখেছিল। বলে দিয়েছিল, শোন্—

এভাবে বললে এই বলবি... ওটা জানতে চাইলে বলবি এটা... মনে থাকে যেন। কিন্তু মনে রেখে রেখেও অবশেষে সব গুলিয়ে গেল। ভিটেমাটির প্রশ্নে সব গোলমাল হয়ে গেল রাশেদের। রাশেদকে ওরা ধরে ফেলল। ধরেই সে রাতে চালান। সোজা ঢুকিয়ে দিয়েছিল এরপর বিডিআরের চোখ এড়িয়ে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে।

পা ফেলছিল রাশেদ আস্তে আস্তে। আন্দাজে জমি মেপে মেপে। জানে, এভাবে গেলে সারা রাতেও বেশিদূর যেতে পারবে না। তবু দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে এটা অন্তত ভালো। ভালো একটা কাজও করছিল রাশেদ। পায়ের সঙ্গে সঙ্গে হাতও বাড়াচ্ছে এখন। যদি সামনে কিছু পড়ে যায় তাহলে হাত দিয়ে অন্তত নিজেকে সামলাতে পারবে।

সামলেই যাচ্ছিল একটু একটু করে। এই সময়েই আচমকা একটা হোঁচট। হোঁচটটা খেয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কিন্তু হাত বাড়াতেই যেন হাতের সামনে কিছু একটা ঠেকে গেল। রাশেদ টের পেল একটা গাছ। আর গাছের গুঁড়ি থেকে নেমে আসা জট পাকানো শেকড়ে সে পা জড়িয়ে হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু গাছটা খুব বড়োসড়ো। কেননা হাত বাড়িয়েও সে গুঁড়িটার ঠিক নাগাল পেল না। রাশেদ তবু দাঁড়ায়। দু'হাত বাড়িয়ে গাছের গুঁড়িটার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না সে ধরতে। হাত তার যায় না গুঁড়ির দুপাশে। তবে অনুমানে টের পায়, গাছটা খুবই বড় ও চওড়া। আর গা বেয়ে কুয়াশারই হিমজল গড়াচ্ছে আস্তে আস্তে। রাশেদের কানে এল, ওপরের পাতা থেকেও জল ঝরার শব্দ। টুপটাপ জল ঝরে পড়ছে শিশিরের।

কিন্তু কোন জায়গা এটা! কাছাকাছি কোনো গ্রাম আছে নাকি? হেয় বিডিআর লোক দুইটা যে কইল পঁচাশি নম্বরের একখান পিলার পড়ব সামনে।

গাছটা ছেড়ে বাঁদিকে এবারে পা বাড়ায় রাশেদ। আর বাড়াতেই ঝপ করে একটা কড়া আলো। আলোটা হলুদ। কুয়াশা ভেদ করে যেন আচমকা এদিকে ঠিকরে পড়েছে। পড়তেই চকিতে সরে যায় রাশেদ। চট করে গুড়িটাকে জড়িয়ে ধরে। এ নিশ্চয়ই বিএসএফের আলো। কুয়াশা থাকলে ওরা যে হলুদ আলো ব্যবহার করে তা একরকম জানা আছে রাশেদের। অর্থাৎ কাছাকাছি বিএসএফের লোকজন আছে। টহলে বেরিয়েছে বোধহয়।

রাশেদ আঁকড়েই ধরল গাছটাকে। আর এমনভাবে ধরল যে দু'দিকে দুটো হাত ছড়িয়েও গেল তার, পা-দুটোও ফাঁক হয়ে রইল। তখন তাকে দেখাল যেন গাছের বাকলে আটকে থাকা কোনো গিরগিটি। সরসর করে উঠতে উঠতে আচমকা থমকে দাঁড়িয়েছে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখল রাশেদ। ফেললে কী জানি যদি টের পেয়ে যায়।

এপাশে ওপাশে ঘুরতে ঘুরতে আলোটা একসময় নিভে গেল। আর নিভতেই রাশেদ চোখ খুলল। তার ডানহাতের ওপরে কী একটা বড় পোকা উঠে এসেছে। কিরার লাখান কিছু একটা। হাতটা ঝাড়া দিয়ে পোকাটাকে ফেলতে যাবে এই সময়েই ঝট করে আলোটা আবার জ্বলে উঠল। আর উঠতেই চোখ ফিরিয়ে রাশেদ লক্ষ করল, হলদে আলোটা এখন দুভাগে চিরে গেছে। গাছ ও গাছের গুঁড়িকে মাঝখানে রেখে দুদিকে দুটো রেখা হয়ে ছিটকে পড়েছে। পড়তেই চমকে উঠল রাশেদ। দু'তিনটে ভারী পায়ের শব্দ। শব্দটা যেন এদিকে এগিয়ে আসছে না? তাই তো মনে হচ্ছে।

দাঁত কামড়ে দম বন্ধ করে পড়ে রইল রাশেদ।

তিন

আলোটা ঘুরছিল এদিকেওদিকে। আর ঘুরতেই টের পেল রাশেদ সে একটা জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। আশেপাশে এলোমেলো গাছ। ঝোপঝাড়। আগাছা। বুনো লতানো উদ্ভিদ। আর তারই ভেতরে লম্বা লম্বা ঘাস। কাঁচা ও শুকনো। সম্ভবত এই জঙ্গলের পেছনেই সেই লম্বা কাঁটাতারের বেড়াটা রয়েছে কোথাও। আর সে বেড়ার ফাঁক দিয়েই ওকে গলিয়ে দিয়েছে বিডিআরের ওই দুজন।

বিডিআরের কথাটা মনে পড়তেই রাশেদের চোয়াল জোড়া শক্ত হয়ে উঠল। তার অত কষ্টের জমানো টাকাগুলো! থলেতে না-রেখে যদি পকেটে রাখত তাহলে বোধহয় যেত না অমন করে।

আলোটা নিভে গিয়েছিল। নিভতেই রাশেদের বুক হিম হয়ে এল। ভারী পায়ের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যেন বা গলার স্বর একটা ভেসে এল খুব কাছেই।

কা ভাই, কুচ মিলা?

বলতে না বলতেই আবারও সেই আলো। জঙ্গলের ভেতরে কুয়াশার চারপাশেই ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে আবার দূরে সরে যেতে লাগল কেঁপে কেঁপে। এবং এরপরেই আবারও একটা গলা। কারা যেন পরস্পর কথা বলতে বলতে আরও কাছে এগিয়ে আসছে।

মিলা ভাই?

নেহী—

লেকিন আওয়াজ তো শুনা।

তব। কঁহা গেইল!

কা জানে—

একজনের কথায় অন্যজনের আবারও সন্দেহ, ও আদমি থা না জানবর?

নানা। আর একজন জানায়, রামজি কা কসম। আদমি থা। আমি লোকটাকে নিজে দেখেছি—

তাহলে, গেল কোথায়?

হতাশায় ও সন্দেহে লোকটি আবারও আলোটা ঘোরায়। এরপর টর্চটা সামনে রেখে এগিয়ে যায়, কী জানি... কোথায় গেল। চল তো দেখি....

ভারী বুটের শব্দ জোড়া সরে যায়। সরতেই হলুদ আলোও অপসৃত। আর ওই তখনই যেন একটু সোজা হয়ে দাঁড়ায় রাশেদ।

সেই কখন বেরিয়েছে সে। তখনও আকাশ বেয়ে সূর্যটা ওঠেনি পুরোপুরি। সবে দিগন্ত ছাড়িয়ে উঁকি ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে। প্রকৃতির ডাকে খালপাড়ে গিয়ে কাজকর্ম সেরে বিলে নেমেছিল রাশেদ। এরপর গোসল সেরে ঠান্ডার ভেতরেই বেরিয়ে পড়েছিল নালুয়াহাটের দিকে। নালুয়াহাট প্রায় ক্রোশ দুইতিন হবে। রাশেদ তাই পা চালিয়েছিল দ্রুত। কখনও রাস্তা ধরে কখনও বা মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে একসময় পৌঁছেছিল নালুয়াহাট। ততক্ষণে শীতের কুয়াশা ভেদ করে রোদ উঠেছে নালুয়াহাটে। লোকজনও বেরিয়ে পড়েছে। পথে-ঘাটে রিকশা আর সাইকেল। রাস্তার দুধারে আলু-কপি ও বেগুনের ঝুড়ি নিয়ে বসে পড়েছে দু-চারজন।

সামনে পড়েছিল একটা কোতোয়ালি থানা। থানার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাজারে গিয়ে একটা ভাতের হোটেলে প্রথমে ঢুকেছিল সে। এরপর যা পেয়েছিল তাই গোগ্রাসে তুলেছিল মুখে। এবং তুলেই যখন আবার বেরিয়ে এসেছে ওই তখনই পুরোপুরি রোদের তাপ। আস্তে আস্তে যেন উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেছিল।

উত্তাপটা ভালোই লাগছিল রাশেদের। ফলে রোদের ভেতরেই বেরিয়ে পড়েছিল। বেরিয়েই হাঁটা। আর হাঁটতে হাঁটতে একে তাকে জিজ্ঞেস করা। নালুয়াহাটের রাস্তা জেনে নেওয়া। এরপর বাজার পার হয়ে লোকালয় পেরিয়ে, মাঠ পার হতে হতে এক গাঁয়ে এসে সে থমকে দাঁড়ায়। জায়গাটা তখন যেন সত্যিই চেনা মনে হচ্ছিল তার। খুবই যেন চেনা। নানি কি তবে এই গাঁয়ের কথাই বলেছিল তাকে? নালুয়াহাট কি? কিন্তু কী বলেছিল তা আর মনে নেই তার। তবে শুকুরুদ্দির কথামতো একটা বিল পেয়েছিল সে। একটা বিল আছে এখানে। বিলের পাড়ে ছায়াও আছে তাল-তমালের। কিন্তু সেই পান কাউয়ার দল! দলটাকে তো দেখছে না আর রাশেদ। তাবাদে সেই চালাটা? চালার ডানদিকে তো একটা হিজল গাছও ছিল। এটা এখনও মনে আছে রাশেদের।

এপাশে ওপাশে তাকিয়ে একটু এগিয়েছে এই সময়েই পেছনে কে!

কারে বিচরাও?

পেছনে তাকিয়েই রাশেদ আবিষ্কার করে একজন ইমাম। পরনে লুঙ্গি মাথায় টুপি গায়ে ফতুয়া। ফতুয়ার ওপর চাদর একখানা চাপানো। রাশেদ শুধোয়, এইডা কি নালুয়াহাট ইমাম সাহেব?

নালুয়াহাট তো ফালাইয়া আইছ।

তয়। এইডা কোন জায়গা?

এইডা বিবিরহাট। কারে খোজ? কী নাম—

আমিরুল।

আমিরুল! কোন গাও..... কী করে? ইমাম অবাক।

রাশেদ জানায়, নালুয়াহাটের পর যে গাঁওখান... হেই গাঁওয়ের কথাই য্যান হুনছিলাম। সামনে একখান বিলও আছে হুনছি—

বিল! ইমাম সাহেব বিলের দিকে তাকিয়েই শুধোন, তা বিল তো পাইছ। অহনে আমিরুলের বৃত্তান্ত কও তো! কী করে আমিরুল?

মুক্তিযোদ্ধা আছিল ইমাম সাহেব—

মুক্তিযোদ্ধা! ইমাম সাহেব বিস্মিত। আর এরপরেই তার গলায় প্রচণ্ড আক্ষেপ, হায় হায় এইয়া করছ কী....এত দেরি কইরা আইলা? কাইল তো তার মওত হইছে। কাইল তারে—

বলতে বলতে ইমাম জানান, কীভাবে কাল বিকেলে তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়। তিনি তো ছিলেনই সারাক্ষণ। এছাড়া ইউএনও আসেন। পুলিশও আসে একদল। তারপর জাতীয় সঙ্গীতের সুর বাজানো হয়। বেজে ওঠে বিউগলের করুণ সুর। এরপর তাকে স্যালুট জানিয়েই শেষ হয় দাফনের কাজ। গোটা গ্রাম ভেঙে পড়েছিল সেই দাফন অনুষ্ঠানে। কত দূর দুর থেকে যে মানুষ এসেছিল তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।

বলতে গিয়েই ইমাম জানান, তা যাও না ক্যান। কাছেই তো বাড়ি। কাল আইতে পার নাই তো কী হইছে। আইজ দেখা কইরা যাও। আমিরুলের মায় আছে বউ আছে পোলা-মাইয়ারাও আছে—

রাশেদ চুপ। একমনে শুনছিল। ওই তখনই ইমাম বলে ওঠেন, যাও। বিল ধইর‍্যা খানিক আউগাইলেই হের ভিটা—

বলা শেষ করেই ইমাম পা বাড়ান। আর ওই তখনই হতাশ রাশেদ ফিরতে থাকে।

না ফিরে উপায় কী! এই আমিরুল তো আর সেই আমিরুল নয়। তাবাদে

মরার আগে নানি যে ভিটে দেখিয়ে তাকে ছেড়ে যেতে বারণ করেছিল সেই ভিটের খোঁজও তো পায়নি সে। তাবাদে ভিটে দেখিয়ে নানি যে গ্রামের নাম বলেছিল ওকে সেটাও ওর মনে নেই। জেলা বা উপজেলা তো দূরের কথা।

ভগ্নোদ্যমেই আবার ফিরতে থাকে রাশেদ। অন্য সময় হলে হয়তো আরও এগিয়ে খোঁজখবর করত। কিন্তু সে এদেশে অবাঞ্ছিত। পালিয়ে পালিয়ে থাকে যখন যেভাবে ঢোকে। কিন্তু দিন দুইয়েক আগে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে সে গা ঢাকা দিয়েই আছে একরকম। ধরাই পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। আর বাঁচিয়েছে ওই শুকুরুদ্দিই। তার কাজের সঙ্গী ওই ছেলেটা।

কাজ একটা পেয়েছিল রাশেদ। বিএসএফের হাতে ধরা পড়ায় দিন পনেরো আগে যখন এদিকে আবার ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওকে ওই তখন থেকেই খোঁজ করছিল কাজের। কিন্তু এদেশে তেমন কাজ নেই কোথায়ও। অথচ কাঁটাতারের বেড়াটা পার হও। পার হলেই কাজ। কাজের অভাব নেই। আর কত রকমেরই না কাজ। মাটি কাটার কাজ। পাথর ভাঙার কাজ। বাড়ি তৈরির কাজ। সেতু বানাবার কাজ। তা তেমন না হলেও নিজের দেশে আবার ঢুকে কাজ একটা জুটে গিয়েছিল রাশেদের। খানিক দূরে নদীর ওপরে একটা ব্রিজ তৈরি হচ্ছিল। কাজটা অনেকদিন ধরেই চলছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ করার লক্ষ্যে আরও বেশি লোক লাগানো হয়েছিল। যোগাযোগ হওয়ায় এক সকালে রাশেদও গিয়ে যোগ দিল সে কাজে। কিন্তু যোগ দেওয়ার পর দুদিনও যায়নি এক দুপুরে আচমকা প্রচণ্ড এক শব্দ। চোখের সামনেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ব্রিজটা। দশ-বারোজন সঙ্গে সঙ্গে চাপা পড়ল। পাঁচ-ছজন নদীতেই তলিয়ে গেল। আহতও হল বেশ কিছু। রাশেদ দূরেই ছিল। ফলে বেঁচে গেল সে। কিন্তু বাঁচলেও থাকতে পারল না সেখানে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুকুরুদ্দি কোত্থেকে উদয় হয়েই ওকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল। উত্তেজিত হয়েই বলল, 'কী অইল..... অহনও খাড়াইয়া আছ....তুমি না আইছ কাইল! কাইল না কামে যোগ দিছ....' রাশেদ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালে শুকুরুদ্দিই ওকে আরও খানিকটা দূরে টেনে নিল ফের, 'পালাও.... পালাও.... পুলিশ আইছে.... অহনে খুঁজতে আছে ওই লম্বা ঠিকাদাররে....ঠিকাদারের লোকজন রে..... কয়েকজনরে নাকি আটকও করছে......

পুলিশের কথায় চমকে উঠেছিল রাশেদ। দিন কয়েক আগেই তো ধরা পড়ায় তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল এদিকে। এখন যদি এদিকের পুলিশ আটক করে তবে জেরাটেরার পর রাশেদের ঠিকানা না পেয়ে হয়তো বিডিআরের হাতেই তুলে দেবে ওকে। তার চেয়ে এখন পালানোই ভালো। কিন্তু কোথায় পালাবে?

ঘর নেই বাড়ি নেই। শুকুরুদ্দি কী বুঝেছিল। বুঝেই ওকে টেনে নিয়ে সোজা নিজের ডেরায়। নদীর পাড় ঘেঁষে অনেকটা দূরে ভাঙা ইট-পাথর আর পলিথিন দিয়ে ঘেরা ওর নিজের খুপরিতে।

ওদিকে ভিড় ততক্ষণে বেড়েছে। টিভির চ্যানেল থেকে সংবাদপত্রের লোকজন আর পুলিশ এসে ঘিরে ধরেছে জায়গাটা। ওরই ভেতরে উদ্ধার কার্য চলছে। সেই সঙ্গে চেঁচামেচি আর হইচই।

বুক কাঁপছিল তখনও রাশেদের। ভয়ে ভয়েই সে দূরের সেই জায়গাটার দিকে তাকাচ্ছিল। তাকাতে তাকাতে কখনও বা আবার নিজের মনেই বিড়বিড়। বিড়বিড় করে কী যে কথা বলছিল। সে কথার শব্দেরা কখনও স্পষ্ট কখনও বা খুবই ক্ষীণ। শুকুরুদ্দি টের পেয়েছিল। পেয়েই সে রাশেদের মুখোমুখি একসময়।

কী কও অমন বিড়বিড়াইয়া—

কী কমু!

তয় যে তোমার ঠোডডা লড়ে—

রাশেদের চোখে তখনও ভয়। ভয়ে ভয়েই সে বলে, ওইডা আমার বৈতাল কথা। নিজের মনেই বকি—

কী বক! শুকুরুদ্দি অবাক, পরস্তাব নাকি?

ধুর অ। একরকম আতঙ্কের ভেতরেই রাশেদের ঠোঁটে হাসি এসে যায়। রাশেদ হেসে ফেলে একটু বোকার মতো, পরস্তাব পামু কই! থাকনের মইদ্যে তো ছিল ওই এক নানি..... তা পরস্তাব হোননের আগেই......

বলতে বলতে চুপ করে যায় রাশেদ। শুকুরুদ্দি তবুও তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

শীতের বেলা। আলো কমে এসেছিল। সন্ধে হতেই খুপড়ির মধ্যে একটা কাপড়ের সলতের ডিবরি জ্বালিয়ে নিল শুকুর। একসময় আবার নিজেই জিজ্ঞেস করল সে,

কাইল আইছ কামে। তোমারে দেখছি কিন্তু নামডা অহনও তোমার জানা হয় নাই বাই। কী নাম তোমার?

রাশেদ। তোমার?

শুকুর—শুকুরুদ্দি। একটু হেসেই সে বলে আবার, কাইল রাতে খিচুরি করছিলাম খাসির মাংস দিয়া.....হের একটু আছে। খাইবা নিকি রাশেদবাই—

রাশেদের খিদেও পেয়েছিল। সে আপত্তি করে না।

শুকুরুদ্দি তখন খুপরির চালার নীচে বাঁশের আড়ায় ঝোলানো শিকেয় রাখা

পাতিলটা নামায়। এবং নামিয়েই বলে, তোমার দ্যাশ আছিল কুনখানে বাই?

রাশেদ চুপ। শুকুরুদ্দি খিচুরি নামিয়ে তা ভাগ করছিল। মাটির মালসায় খানিকটা তুলে রাশেদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, কই আছিল দ্যাশ.....কইলা না তো?

কী কমু!

কী কমু মানে! দ্যাশ নাই তোমার?

ও মা, থাকব না ক্যান! মাইনষেরই তো দ্যাশ থাকে। রাশেদ বিড়বিড় করে, দ্যাশ আছিল ঘর আছিল—

ঘর আছিল... কোনহানে কও তো?

কোনহানে আবার এইহানে। বাংলাদ্যাশে—

এই দ্যাহো....কও কী! শুকুরুদ্দির ঠোঁটে হাসি, তুমি য্যান রহস্য করো বাই। রহস্য কইর‍্যা কথা কও। নিজের ভাগের খিচুরিটা নাড়তে গিয়ে পরপর দুটো মাংসের টুকরো পেয়েছিল শুকুর। ওই তারই একটা রাশেদের মালসায় দিয়ে আবার চোখ তোলে, বাংলাদ্যাশ কী আর এইডুকু! কোন জিলায় কইবা তো? জিলা আছে উপজিলা আছে ইউনিয়ন আছে থানা আছে....

রাশেদ চুপ করেই ছিল। মিটমিটে আলোয় শুকুরুদ্দি লক্ষ করল, কিছু একটা যেন বলতে চাইছে মানুষটি। কিন্তু বলতে গিয়েও পারে না। তখন শুকুরই আবার জিজ্ঞেস করে, নানির কথা তো কইলা কিন্তু তোমার মায়-বাপ!

বাপেরে আমি দেহি নাই—

ক্যান!

খিচুরি মুখে তুলতে গিয়েই রাশেদ একবার থমকে তাকায়। এরপর বলে, কেমনে দেহুম কও আমি তো তহন মায়ের প্যাডে। বাপ মরণের তিনমাস পর ভূমিষ্ঠ হই—

তা বাপ মরল ক্যামনে!

মরল কই মাইর‍্যা তো ফালাইল। বাপ আছিল কিষাণ। তয় বন্দুকও ধরছিল। জয়বাংলা কইত। এক রাইতে খানসেনা গো ক্যাম্পে গিয়া দশ-দশজন খান সেনারে মারে। কিন্তু ধরা পইড়্যা বুঝি ওই দশখানই গুলি।

আর তোমার মায়?

মায়ের কথা আমার মনে নাই। নানির কাছে হুনছি আমার যখন তিনমাস বয়স, রাজাকারেরা আইয়া মায়রে লইয়া গিয়া খানসেনাগো হাতে তুইল্যা দেয়। হেয়ার পর আর মায় ফেরে নাই—

বলতে বলতে একটু থেমে আবারও বলতে থাকে রাশেদ, জানো আমার

একখান ভিডা ছিল। বাপ-ঠাকুর্দার ভিডা। বিলও আছিল ভিটার পাশে একখান। হেই বিলে ছাওয়া পড়ত তাল-তমালের। ছাওয়া পড়ত বট-পাকুরের। আর কী যে পান-কাউয়ার দল.... কী কমু তোমারে..... খালি ডুব মারে আর ঘেডি তোলে...... ডুব মারে আর ঘেডি তোলে.....

তা কী অইল সেই ভিটাখানের! শুকুরুদ্দি তাকায় অবাক হয়ে।

রাশেদ জানায়, কী আর অইব.... নানিও গেল আর আমার প্যাডের খুদাও গেল চইড়্যা। কী খুদা রে বাই.... প্যাডের মইদ্যে যহন জিকির পাড়ে সইজ্য করতে পারি না। অথচ চাইলেও কেউ খাইতে দেয় না। পোন্দে লাথ্থি মারে। কয় কাম কর। হ্যাযে সেই কামের লাখানই পথে পথে ঘুরি। যে যা কাম দেয় তাই করি। আর হারাদিনমান কাজের পর রাইতের দিকে আন্দারে-ওন্দারে হুইয়া থাকি। এমুন করতে করতে হ্যাষকালে যখন মনে পড়ল তখন অনেকগুলি বচ্ছর পার। আর ভিডায় ফেরনের রাস্তাও গেছি ভুইল্যা। গেরামের নামও মনে নাই। কী কইর‍্যা থাকব কও। সেই কোন গ্যাদা বয়সে লামছি পথে—

শুকুরুদ্দি অবাক হয়ে শুনছিল শুনতে শুনতেই বলল এখন, এই দেখ তয়লে কী আর ওই ভিডাখান আছে অহন.... কে কোনহান থিকা দখল কইর‍্যা লইছে—

বলতে বলতে শুকুরুদ্দির কী মনে পড়ে যায়।

আইচ্ছা এক কাম কর তো..... নালুয়াহাট নি চিনো তুমি?

নালুয়াহাট! না চিনি না বাই—

আইচ্ছা আমি চিনান দিতে আছি—বলতে গিয়েই শুকুর বুঝিয়ে দেয় তাকে। দিয়েই বলে, নালুয়াহাটে য্যান একখান বিলের কথা হুনছিলাম। ঠিক যেমুন তুমি কইতে আছো..... দেহ না গিয়া.....

যামু?

হ যাও। অহন থিকা যেহানে যেহানে কামে যাইবা এই বিল খানের কথা জিগাইবা লোকেরে... তোমার বাপের কথাও কইবা... তোমার বাপে তো মুক্তিযোদ্ধা আছিল.... চিনতেও পারে.... দেহ না গিয়া—

তয় দেহি একবার তোমার কথা হুইন্যা। কাইল ভোর সুম বাইর অইয়া যাই তয়লে—

শুকুর মাথা নাড়ে, হ যাও। পাইলা কিনা দুপৈরে ফিরা আমারে কইও। আমি ঘরে না থাকলেও বইবা কিলাম। আর একখান কথা... ভুল কইর‍্যাও অহনে ভাঙ্গা ব্রিজের দিকে যাইও না.... আহো না ফিরা.... কাম একখান জোগাড় অইবই—

শুকুর আশ্বাস দিলেও নালুয়াহাট থেকে ফেরার সময় আর শুকুরুদ্দিনের

কাছে ফেরার ইচ্ছে হয়নি রাশেদের। কী করেই বা হবে। একে ধরা পড়ার ভয় তার ওপর কাজ নেই এদেশে সেভাবে। ফলে মুহূর্তেই মনোহরপুরের কথাটা মনে পড়ায় সে রাস্তা বদল করেছিল। করেই ওই উন্মুক্ত প্রান্তরে। তামাকের খেতের পাশ দিয়েই হাঁটতে শুরু করেছিল। হাঁটতে হাঁটতে পরে ওই মনোহরপুর। কিন্তু কে জানত, কুয়াশার আঁধারে ওখানে অমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ওই দু'জন বিডিআর। জানলে কী আর আজ ফেরে? শুকুরুদ্দির কাছেই চলে যেত আবার।

রাশেদ সরে এল। তবুও গাছটাকে একেবারে ছাড়ল না সে। ছাড়ার আগে ভালো করে আবারও বুঝে নেওয়া দরকার। বিএসএফের ওই জওয়ান দুজন চলে গেছে তো? কানখাড়া করে খানিক দাঁড়িয়ে রইল রাশেদ। এরপর অন্ধকারেই একটু একটু করে পা বাড়াল।

চার

এখন এদিকে কুয়াশা যেন আরও ঘন, আরও গভীর হয়েই নেমে এসেছে। সেই সঙ্গে তীব্র ও কনকনে ঠান্ডা। হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে সন্তর্পণে পা ফেলতে লাগল রাশেদ। আর এমন করেই ফেলতে থাকল যাতে শব্দ না হয়। শব্দ হলেই বিপদ। কেননা নীচে ইতস্তত শুকনো পাতা। পা পড়লেই তাই শব্দ উঠবে খসখস করে। আর বন্য-নিস্তব্ধতায় সে শব্দ ছড়িয়ে পড়বে অনেকটা দূর পর্যন্ত। তাহলেই হয়েছে। কাছাকাছি থাকা সেই জওয়ান দুজনেরও কানে নিশ্চয়ই পৌঁছুবে সে শব্দ। এবং পৌঁছুলেও আবারও তারা এদিকে ফিরে আসবে। নিঃশব্দে এক-পা দু-পা করে এগোতে লাগল রাশেদ। অনেকটা ওই বকের মতো পা তুলে তুলে।

বকের মতোই নিঃশব্দে পা ফেলছিল সে। ফেলতে ফেলতে আবার থমকেও দাঁড়াচ্ছিল। রাত খুব একটা হয়নি এখনও। তবুও কোথায়ও একটা রাতপাখি। সম্ভবত ওর মাথার ওপরে কোথায়ও ডাকছিল। চোখ না তুলেও রাশেদ বুঝল দেখা সম্ভব নয়। তবে মাথায় ঢাকা চাদরটা যে কুয়াশায় ইতিমধ্যেই ভিজে উঠেছে তা টের পাওয়া যাচ্ছিল।

পা ফেলতে ফেলতেই একসময় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কিছু মনে হওয়ায় যেন কানখাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো কিছুই আর কানে এল না। না আসায় টের পেল, সেই জওয়ান দুজন আর ধারেকাছে নেই কোথায়ও। অনুমানে পা বাড়িয়ে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল রাশেদ।

এগোল তবে হাতদুটো আর নামাল না। না নামানোয় রাশেদের হাতের

নাগালে এসে যাচ্ছিল কখনো-কখনো গাছের গুঁড়ি, কখনও বা কোনো ঝোপঝাড়।

পা টিপে টিপে হাত বাড়িয়ে নিঃশব্দেই এগিয়ে যাচ্ছিল রাশেদ। একসময় তার হাতের নাগালে শক্ত কিছু একটা এসে ঠেকল। কী এটা! থমকে দাঁড়াল রাশেদ। একটু দাঁড়িয়ে এরপর জিনিসটা পরখ করতে গিয়েই বুঝল, ঢেউ খেলানো একটা টিনের বেড়া। বেড়া কেন? হাত বাড়িয়ে হাতের তালু দিয়ে চেপে চেপে বেড়াটা বোঝার চেষ্টা করল রাশেদ। আর বুঝতে গিয়েই এবারে টের পেল একটা বাড়ি। বাড়ির পেছন দিক। কী জানি আবার বিএসএফের ক্যাম্প নয় তো এটা—? রাশেদ কিছুটা সময় চুপচাপই দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই কানে এল না। না আসায় সে নিঃশব্দে বাড়িটার পেছনেই বসে পড়ল।

ওদিকে রাত যত বাড়ছে কুয়াশার তান্ডবও তত বেশি। সেই সঙ্গে দুঃসহ ও অসহ্য ঠান্ডা। মাঝেমধ্যে নাকমুখে এসে যেন ছুরির ফলার মতো বিঁধে যাচ্ছে। তাছাড়া শরীরও চলছে না। সারা শরীরে বিপুল এক ক্লান্তি। সেই কখন থেকেই হাঁটছে সে। ফলে ক্লান্তি যেমন খিদেও তেমনি। খিদেয় পেটের ভেতরটা যেন দুমড়ে-মুচড়ে উঠছে। সঙ্গে অবশ্য মুড়ি আছে খানিকটা। রাশেদের মনে পড়ল, বিডিআরের কাছে থলের ভেতরের সব কিছু বের করে দেখালেও তোলার সময় প্লাস্টিকে জড়ানো মুড়ির ঠোঙাটা সে আবার থলের ভেতরেই ভরে নিয়েছিল।

চাদরের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে থলেটা টেনে আনতে গেল রাশেদ। কিন্তু আনতে গিয়েই চমকে উঠল। খসখস করে একটা শব্দ হচ্ছে। অনেকটা ওই শুকনো পাতা কিংবা কাগজের ঠোঙাটোঙা সরালে যেমন হয়। রাশেদ তাকাল শব্দ না করে। কিন্তু তাকিয়েও কিছু চোখে পড়ল না। একে অন্ধকার তারওপর জমাটবাধা কুয়াশা। রাশেদ সতর্ক হয়েই মুখ ফেরাল। আর ফেরাতেই শব্দটা যেন আরও কাছে। রাশেদ ভয়ে সিটিয়ে গেল। সেই দুজন বিএসএফ কি? ঘুরতে ঘুরতে কি এদিকেই এসে গেল! কিন্তু ওরা এলে তো আলো ফেলবে। বড় টর্চের হলদে আলো। তা আলো না ফেলে....

রাশেদ কানখাড়া করে রইল।

শব্দটা এবারে যেন আরও কাছে। রাশেদ তার হাতদুটো বুকের ওপরে জড়ো করে রইল। এবং এরপরেই আবিষ্কার করল, মানুষ নয় কোনো জন্তু। ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে রাশেদের প্রায় শরীর ঘেঁষেই এসে দাঁড়িয়েছে কখন। কিন্তু কী জন্তু এটা? সন্তর্পণে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পেছনে তাকায় রাশেদ। আর

তাকাতেই বাঁ হাতে একটা লোমশ শরীরের স্পর্শ। রাশেদ ভয়ে সিঁটিয়ে ওঠে। এমনিতে ভয়ডর বড়ো কম রাশেদের। কিন্তু প্রতিপক্ষকে দেখা না গেলে তার চরিত্রই বা বোঝে কী করে! দেখা গেলে, সে যতবড় শক্তিধর প্রতিপক্ষই হোক না কেন রাশেদের তাতে ভয় নেই।

রাশেদ চুপ। নড়াচড়াও করে না। এদিকে জন্তুটা বার দুই রাশেদের পাশে ঘুরে আগের মতোই আবার ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে সরে গেল। গিয়ে একবার চক্কর খেয়ে মুহূর্তমধ্যে আবারও রাশেদের পিঠের কাছে। কী জন্তু এটা! কুকুর না কোনও গোরু? নাকি কোনো ভাম! শেয়ালও হতে পারে। শেয়াল হলে অবশ্য এমন শব্দ করবে না। নিঃশব্দ উপস্থিতিই তার বেশি পছন্দের। তাহলে কি কোনও বুনো শুওর? রাশেদ অন্ধকারেই একটু একটু করে হামাগুড়ি দেয়। পরে খুব সন্তর্পণেই টিনের দেওয়ালটা ধরে এগিয়ে যায়। গিয়ে আবারও পেছনে তাকাবে এই সময়েই কানে আসে একটা কাশির শব্দ। খুব জোরে জোরে বেশ কয়েকবার কেউ যেন কাশছে খণ্ডখণ্ড করে। এবং কাশির পরেই একটা ক্ষীণকণ্ঠ: 'বউ—অ বউ।'

ডান হাতের ওপরে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় রাশেদ। দাঁড়িয়ে টিনের দেওয়ালের গায়ে খুবই সাবধানে একদিকের কানটা চেপে ধরে। ধরতেই কনকনে ঠান্ডা ও সপসপে ভেজা জল গড়ানো টিনের বেড়ার ওপারে আবারও সেই গলার আওয়াজ : 'বউ—অ বউ—একবার আইলি!' কান সরিয়ে আনতে গিয়েই রাশেদ টের পেল কোনও অসুস্থ মানুষ। বিছানায় শুয়ে কাউকে ডাকছে।

পা আবার বাড়িয়েছিল রাশেদ, আর বাড়াতে গিয়েই মাথার ওপরে টুপ করে ভারী একটা জলের ফোঁটা। ওপরে না তাকিয়েও বুঝল ঢেউ খেলানো টিনের চালা থেকেই শিশির গড়িয়ে নামছে বৃষ্টির ফোঁটার মতো। নেমে ছেঁচতলায় পড়ছে টুপটাপ। পড়েই মাটির ভেতরে গেঁথে যাচ্ছে। ছেঁচতলা ধরেই এগোতে থাকে রাশেদ। একবার পেছনেও তাকায়। কিছু দেখা না গেলেও কানখাড়া করে বোঝার চেষ্টা করে, সেই জন্তুটা আবারও আসছে কিনা পেছনে। কিন্তু সাড়া না পেয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়।

টিনের দেওয়ালটা হাতড়াতে হাতড়াতেই রাশেদ এগোচ্ছিল। একটা বাড়ি যখন পাওয়া গেছে তখন লোকালয়ও নিশ্চয়ই শুরু হয়েছে। আজকের রাতটা কোনোরকমে এই গ্রামে কাটিয়ে কাল ভোর ভোর থাকতেই বেরিয়ে পড়বে সে। যেভাবেই হোক বারসইয়ের দিকে চলে যেতে হবে তাকে। কিন্তু রাতটা কাটানোই এখন দুষ্কর। যেভাবে ঠান্ডায় কেঁপে উঠছে শরীরটা তাতে কতক্ষণ যে বাইরে এভাবে থাকতে পারবে কে জানে! এর চেয়ে কোনো চালাটালা

বা গোশালা পেয়ে গেলেও হত। রাতটুকু অন্তত কাটাতে পারত। পরে ভোরের দিকে উঠে বারসইয়ের রাস্তাটা নাহয় জেনে নিত সে। ভাবছিল রাশেদ, আবার এ-কথাও মনে হচ্ছিল, বিএসএফের নজরে যখন পড়েছে তখন গ্রামে ঢুকে কাল থেকেই না তল্লাশি শুরু হয়ে যায়। এজন্য সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলিতে কোনও উটকো লোককে সচরাচর কেউ ঢুকতেও দেয় না কারো বাড়িতে। তা সে এদিকেই হোক, বা ওদিকে।

হাতড়াতে হাতড়াতে একটা কাঠের খুঁটির গায়ে হাত এসে ঠেকেছিল রাশেদের। খুঁটিটা হাত দিয়ে ধরেই রাশেদ বুঝল একটা বারান্দা। ওই ঘরটিরই পেছন থেকে ঘুরতে ঘুরতে এখন সামনের দিকে এসে পৌঁচেছে সে। কিন্তু পৌঁছলেও ঘুটেঘুটে অন্ধকার ও চাপবাধা কুয়াশায় কোথায় যে দরজা আর কোথায় কী আছে কিছুই সে অনুমান করতে পারল না। একটু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রাশেদ। দাঁড়িয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই বুঝতে না পেরে কোনদিকে যে এগোবে তা আর ঠাহর করতে পারল না। না পেরে অন্ধকারেই এদিকেওদিকে তাকাচ্ছে, এই সময়েই কোথায়ও একটা খুট করে শব্দ। আর তারপরেই একটা আলোর রেখা। চোখে পড়তেই আচমকা চোখ ধাঁধিয়ে যায় রাশেদের। পরে হঠাৎই সে বসে পড়ে। নিশ্চয়ই কোনো দরজা খোলা হয়েছে। আর দরজা খুলেই বেরিয়ে আসছে কেউ। ফলে বসে না পড়লে কী জানি ওকে দেখে হয়তো চিৎকারই করে উঠবে। তাতে হিতে বিপরীত। হয়তো বিএসএফের কানেও চলে যেতে পারে। আর গেলেই সে ধরা পড়ে যাবে। তবে যা কুয়াশা ছড়াচ্ছে তাতে তাকে দেখাই মুশকিল।

চুপচাপই বসেছিল। এমনই সময় রাশেদের চোখে পড়ল হারিকেন হাতে একটা মেয়েছেলে। দরজা খুলে বেরিয়ে এসেই একবার থমকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কী দেখে বাঁদিকে একটু সরে গেল। গিয়ে চাটাইয়ে ঘেরা একটা জায়গায় খুটখাট কী করেই আবার লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ফিরে এল। এসেই আবার দরজা ঠেলে ভেতরে। মুহূর্তেই আবারও অন্ধকার। কিন্তু ততক্ষণে যা দেখার দেখে নিয়েছে রাশেদ। আর বুঝতে পেরেছে এটা একটা বারান্দা। খোলা দাওয়ার একপাশে একটা চাঁচারির বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা খুপরিও আছে। ওই খুপরিতে ঢুকেই কী করে আবার বেরিয়ে এসেছে মেয়েছেলেটি।

কী ভেবে রাশেদ উঠে দাঁড়ায়। খুব সন্তর্পণে এরপর নিঃশব্দেই দাওয়ার ওপরে উঠে পড়ে। আন্দাজে পা ফেলে ফেলে পরে সেই খুপরির ভেতরেই ঢুকে পড়ে।

এখন এখানে কুয়াশার দাপটটা অনেক কম। খোলা দাওয়ায় হু হু করে কুয়াশ

উড়ে এলেও বাইরের থেকে জায়গাটা একটু আরামদায়ক। অন্তত ওই মেয়েছেলেটি আর বেরিয়ে না এলে আজ রাতটা এখানেই কাটিয়ে দিতে পারবে নিশ্চিন্তে। অন্ধকারেই হাত বাড়ায় রাশেদ। বাড়াতেই একটা চাটাইয়ের বেড়া। ওপরে আড়াআড়িভাবে একটা দড়ি টাঙানো। তাতে কিছু কাপড়জামা ঝোলানো। এছাড়া কুয়াশা আর অন্ধকারে অন্যকিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছিল না। তবে ফিকে একটা গোবরের গন্ধ যেন উঠে আসছিল নাকে।

দেখতে দেখতে কখন বসে পড়েছিল এবং বসে কখন যে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই রাশেদের। খেয়াল হল হঠাৎই একটা আওয়াজে। চমকে উঠে চোখ মেলতেই রাশেদের নজরে পড়ল এক যুবতী বউ। একটা প্লাস্টিকের বালতি হাতেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু এখন আর অন্ধকার নেই। না থাকলেও দাওয়ার চারপাশেই অজস্র হিমকণা। একে অপরের সঙ্গে জমাট বেঁধেবেঁধে পাক খেয়েখেয়ে এখনও বারান্দায় ঘুরছে। কিন্তু ঘুরলেও ভোরের আলোয় যেন একটু স্বচ্ছতাও এসেছে আবার তার ভেতরে। ফলে দেখা যেন যাচ্ছে এবারে কিছু কিছু।

রাশেদ কুঁকড়ে যায়। এই মেয়েছেলেটিকেই যেন কাল রাতে হারিকেন হাতে বোরোতে দেখেছিল সে। বেরিয়ে এই খুপড়িতেই আসে। কিন্তু এখন কি আবার ঢুকবে নাকি এখানে! ঢুকলেই বিপদ। তার চেয়ে আর খানিকক্ষণ এভাবে থাকতে পারলে একসময় না একসময় বেরিয়ে যেতে পারবে রাশেদ।

ভয়ে ভয়েই চুপ করে ছিল রাশেদ। এই সময়েই মেয়েছেলেটি দরজাটা টেনে দিয়ে বালতিটা হাতে করে দাওয়া থেকে নামতে গিয়েই আবার ঘুরে দাঁড়াল। এবং দাঁড়িয়ে হঠাৎই মাথায় ঘোমটাটা টেনে দিল। টেনে দিয়েই যেন থমকে দাঁড়িয়েছে কারো কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য। আর ওই তখনই রাশেদের কানে এসেছে ভারী পায়ের আওয়াজ। খটখট শব্দ তুলে যেন কারা এসে দাঁড়াল দাওয়ার সামনে।

কই আদমি ঘুষা ইধর—!

রাশেদ চমকে উঠল। সেই বিএসএফ জওয়ান দুজনের কেউ বোধহয়। বউটিকে দেখেই জিজ্ঞেস করছে।

বউটি মাথা নাড়ে। মুখ নামিয়েই ফিসফিসিয়ে জানায়, না—দেখি নাই তো—

দেখলেই খবর দেবে। খেয়ান রাখনা।

বউটির মাথা কাত হয় আবারও।

ভারী বুটের তলায় আবারও শব্দ ওঠে। শব্দগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। মিলিয়ে যেতেই ঘোমটাটা নামিয়ে বউটি ফের দাওয়ার বাইরে।

রাশেদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আর একটু হলেই ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কী। ভাগ্যিস বউটি তাকায়নি এদিকে। তাকালেও হয়তো কুয়াশার জন্য অতটা দূর থেকে চট করে নজরে পড়ত না। আবার পড়লেও পড়তে পারত। তা পড়েনি যখন আপাতত সে নিশ্চিন্ত। তবে রাতে ধরতে না পেরে বিএসএফের জওয়ান দুজন যেভাবে মরিয়া হয়ে ঘুরছে তাতে যেকোনো মুহূর্তেই তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা। এদিকে বউটি ফিরলেও বিপদ। সারাদিনে কি একবারও আর আসবে না এই খুপরিটায়?

রাশেদ চিন্তায় পড়ে। আর পড়তেই আবারও শব্দ একটা। রাশেদ চমকে ওঠে। সেই বউটি। জলের বালতিটা নিয়ে ফিরে এসেছে। ফিরে এসে বালতিটা রাখল দাওয়ার নীচে। ইঁটের সিঁড়ির একপাশে। এরপর সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে মগে করে জল নিয়ে পা দুটো ধুয়ে নিল। এই ভোরে এত ঠান্ডায়ও সে চান করে এসেছে বোধহয়।

বউটি নীচু হল। ইঁটের সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে তার পায়ের ওপর থেকে ভেজা শাড়ির খানিকটা তুলে নিয়ে সে চেপে চেপে জল নিঙরালো। পরে বুক থেকে ভেজা গামছাটা নামিয়ে নিঙরে তা দিয়ে খোলা চুল ঝাপটাতে থাকল। খানিক পরে ঝাপটানো শেষ করেই একসময় দাওয়ায় উঠে এল। উঠে যেখানে আশ্রয় নিয়েছে সে সেই খুপরির দিকেই এগিয়ে এল।

বুক ঢিবঢিব করছিল রাশেদের। এখন সে কী করবে? ছুটে পালিয়ে যাবে নাকি নিশ্চুপ বসেই থাকবে এখনও! কিন্তু বউটি এসে যখন তাকে দেখবে?

নিঃশ্বাস বন্ধ করেই পড়ে রইল রাশেদ।

বউটি ভেতরে ঢুকল। কিন্তু রাশেদ যেখানে বসে আছে সেদিকে আর এগোল না। বরং রাশেদের উল্টোদিকে, খুপরির এক কোণায় দাঁড়িয়ে সে ভেজা কাপড় ছাড়তে শুরু করল।

এতক্ষণ লক্ষ করেনি তাছাড়া কুয়াশার জন্য দেখাও যাচ্ছিল না তেমন, এবার একটু ভালো করে তাকাতেই রাশেদের নজরে পড়ল একটা লম্বা পাড়ের দড়ি। আর তারই ওপরে বউটির শাড়ি-শায়া, ব্লাউজ ও ব্রেসিয়ার। কাল রাতে অন্ধকারে ঢুকতে গিয়ে এই দড়িটাই যেন হাতে লেগেছিল তার। চুপচাপ ঘাপটি মেরে পড়ে রইল রাশেদ। আবার আড়চোখে বউটিকে লক্ষও করল। যদি এদিকে না তাকায় তো ভালো। ভেজা কাপড় পাল্টে নিয়ে সে ঘরে ঢুকে গেলেই বেরিয়ে পড়বে রাশেদ। বাইরে তো কুয়াশা আছে এখনও যথেষ্ট। থাকবেও অনেকটা বেলা পর্যন্ত। কাজেই এই সুযোগে তাকে বেরোতেই হবে। বেরিয়ে বিএসএফের চোখ এড়িয়ে সরে পড়বে একসময়।

নিঃশ্বাস বন্ধ করেই বসেছিল রাশেদ। বসে বসেই চাদরের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে চোখজোড়া তুলছিল। আর তুলতে গিয়েই একসময় আবিষ্কার করল বউটির গায়ে আর জামা নেই। ভেজা ব্লাউজটা খুলে ফেলে দড়ি থেকে শুকনো একটা ব্লাউজ টেনে নিয়েছে। নিয়েই হাত তুলে সেটা গায়ে গলাতে শুরু করেছে। খুপরির ভেতরে কুয়াশা ঢুকলেও কাছাকাছি থাকায় বউটিকে দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল না রাশেদের। ফলে কুয়াশায় ভেজা গোলাকার দুটি উন্মুক্ত স্তন তার চোখের ওপরে ভেসে উঠল। রাশেদের কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।

হতদরিদ্র এক দিনমজুর সে। শৈশব থেকেই পথে পথে ঘুরছে। বেড়েও উঠেছে পথে-প্রান্তরে। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ও শীতের বাতাসে চির খেতে খেতে। কাজেই এমন অভিজ্ঞতা যে রাশেদের নেই তা অন্তত বলা যাবে না। বরং দেখেছে, চোখে পড়েছে এমনকি কখনো কখনো লক্ষও করেছে মন দিয়ে। কিন্তু এভাবে কোনোদিন সাড়া পায়নি। অথচ এখন নজরে পড়ায় যেন শরীরে কীসের এক চাঞ্চল্য। এই ঠান্ডায়ও যেন রাশেদ উত্তপ্ত হচ্ছে এই মুহূর্তে। এমনকি সে যে পলাতক ও যে কোনো সময়েই ধরা পড়তে পারে সে ভাবনাও মন থেকে উধাও। রাশেদ তাকাল এক নিষিদ্ধ তাড়নায়। আর চাদরটা সরিয়ে মাথা তুলতেই হঠাৎই চোখে চোখ। বউটির নজরে পড়ে গেল এবং পড়তেই আচমকা গলায় একটা ভয়ার্ত শব্দ। আর তারপরেই চিৎকার। কিন্তু চিৎকারটা আর শোনা গেল না। তার আগেই ক্ষিপ্র একটা জন্তুর মতো বউটির ওপরেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে রাশেদ।

পাঁচ

লাফিয়েই পড়েছিল রাশেদ। নিমেষেই এক লাফে বউটির কাছে গিয়েই তার মুখের ওপরে হাত। ঠোঁট দুটো চেপে ধরেই তাকিয়ে রইল। পরে বলে উঠল চাপা গলায়,

চুপ। চুপ যাও। চিক্কইর পাইড় না। আমি সব কইতে আছি। ডরানের কাম নাই—

বউটি তাকিয়েছিল। একসময় রাশেদ তার মুখ থেকে হাতটা নামায়। কিন্তু অন্য একটা হাতে ধরা বউটির বাহু সে ছাড়ে না। এমনকি মুখ থেকে নামানো হাতটাও সে রেডি রাখে। কী জানি যদি হঠাৎই আবার চিৎকার দিয়ে বসে। দিলেই ওই হাতটা আবার চেপে ধরবে মুখে।

বউটির আতঙ্ক তখনও কাটেনি। সে তাকাচ্ছিল তখনও ফ্যালফ্যাল করে। যেন নিজের চোখকেও এখন বিশ্বাস করতে পারছে না এই লোকটিই অমন

ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখটা তার চেপে ধরেছিল। কিন্তু লোকটা কে? এই লোকটিই কি তাহলে কাল ঢুকেছে এদিকের বর্ডার দিয়ে। তাড়া খেয়েছে বিডিআরের। আর বিএসএফও তাই খবর পেয়ে হন্যে হয়ে ঘুরছে। এমনকি পাড়ায় ঢুকে একটু আগে ওকে জিজ্ঞেস করে গেছে। অথচ তখনও কি জানত, লোকটা ওদের ঘরে ঢুকে এই খুপরিতেই গা ঢাকা দিয়ে আছে।

ভয় একটু কমে এসেছিল। একসময় সে শুধোল, কে তুমি!

বউটির বাহু থেকে হাতটা ততক্ষণে নামিয়েছে রাশেদ। মাথার চাদরটাও যেন একটু সরিয়ে নিল।

আমি রাশেদ। রাশেইদা কইয়াই ডাকে হগলে.... যেহানে যখন কামে লাগি—

বউটির মুখে যেন কথা নেই। সে ততক্ষণে বিস্মিত। কী কারণে প্রায় বোবাই হয়ে গেল। বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে সে বলল একটু পরে। শুধোল, কই থিকা আইছ?

একবার এপাশে ওপাশে তাকায় রাশেদ। ফিসফিস করেই বলে তারপর, কমু কমু। সব কমু তোমারে। হুদু অহনে একটু লুকাইয়া থাকতে দাও। এই বেলাডা থাকি এইহানে। বৈকালে যামু গিয়া—

তা তো যাইবা কিন্তু থাকবা ক্যামনে? ভয় যেন আস্তে আস্তে তখন কমে গেছে বউটির। জানাল একসময়, লোকজন যদি ট্যার পাইয়া যায়। তোমারে লুকাইয়া রাখনের অপরাধে আমারে না আবার ধইর‍্যা লইয়া যায়!

না না, তোমারে ধরব ক্যান? ক্যান ধরব তোমারে?

বলতে বলতে আরও কী বলতে যাচ্ছিল এই সময়েই ভেতর থেকে যেন কার গলা ভেসে এল। দুর্বল গলায় কেউ ডেকে উঠল, বউ—অ বউ?

রাশেদ ছিটকে সরে যাচ্ছিল। বউটি বাধা দিল, না না আইব না। আইতে পারব না। উইঠ্যা আহনের ক্ষমতা নাই। বুইড়্যা মানুষ—

রাশেদ থমকে দাঁড়ায়। ওই তখনই আবার ভেতরের কণ্ঠটি, কার লগে কথা কস! অ বউ—

বউটি গলা তোলে, এই আহি। ভিজা শাড়িখান মেইল্যা দিয়া যাই।

বলতে বলতে বউটি আবার রাশেদের দিকে ফেরে। তখনও তার চোখ থেকে বিস্ময় সরেনি একটুও।

খাড়াও, যাইও না। অবিশ্যি গেলে অহনে ধরা পইড়্যা যাইবা। হেই জওয়ান দুইডা আছে অহনও পাড়ার মইধ্যে। তার চাইয়া ঘাপটি মাইর‍্যা পইড়্যা থাহো। আমি একবার দেইখ্যা আহি বাপেরে—

বাপ! চাদরের ফাঁক দিয়ে রাশেদ তাকায় আবার বউটির দিকে।

বউটি জানায়, হ আমার হউর। পোলা যাওনের পর থিকা হেই যে একদিন আইয়া বিছানায় পড়ল...

কত বড় পোলা!

আমার সোয়ামি—

রাশেদ চমকে ওঠে। বউটির দিকে একটু সময় তাকিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার গলা নামায়, গেল কই?

মুখ ফিরিয়ে নেয় বউটি। এই সময়েই ভেতরের গলা, কে আইল! কার লগে কথা কস—অ বউ?

বউটি সন্ত্রস্ত। রাশেদের দিকে তাকিয়ে জানায়, খাড়াও। আগে একবার ঘুইর‍্যা আহি। না আইলে....

ভেজা শাড়ি-সায়া ও ব্লাউজ বালতিটার মধ্যে রেখেই এগিয়ে যায় বউটি। খুপরি থেকে বেরিয়েই ভেতরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই দরজার পাল্লা একটু ঠেলেই মুখ বাড়ায়, কী—ডাহেন ক্যান?

ডাহি, কেউ য্যান ঢুকল মনে লয়—বিছানার ভেতরে একটু কাত হয়ে উঠে বসেছিল বুড়ো। বউয়ের সাড়া পেয়েই মুখ তুলল, কে ঢুকল?

বউটির বুক কেঁপে ওঠে। একবার পেছনে কুয়াশাচ্ছন্ন দাওয়াটায় চোখ বুলিয়েই আবার ঘরের ভেতরে চোখ রাখে।

কই ঢুকল! আমি তো দেহি না—

তয় কথা য্যান হোনলাম।

ওই বিএসএফ আইছিল। খোঁজখবর কইর‍্যা গেল—

ক্যান! আবারও ঢুকছে বুঝি কেউ? বুড়োর মুখে উদ্বেগ। বললও যেন উৎকণ্ঠা নিয়েই একরকম, দরজা এক্কারে খুলবি না কিলাম হোইন্ধার পর। হ্যাষে কেউ ঢুইক্যা পড়লে ওই বিএসএফের যত হম্বিতম্বি বেবাক আমগো ওপর.....

বলতে বলতে একটু কাশে বুড়ো। আর এরপরেই শুধোয়, আইজ কুয়াশ লাগছে ক্যামন?

কানখাড়া করেছিল রাশেদ। বউটির কথা কানে এল, খুব লাগছে। অহনও পরিষ্কার হয় নাই—

বুড়ো কী ভাবে। ভাবতে ভাবতেই একসময় আবার প্রশ্ন, অঘ্রাণের আইজ কত হইল বউ?

বউটি হিসেব করে। গত পরশু আঠারো গেলে আজ হবে কুড়ি। তারিখটা বুড়োকে জানায় সে। কিন্তু জানাতেই বুড়োর গলায় আক্ষেপ। সর্দিবসা গলায়

কথাগুলো যেন ঘর্ঘর করেই উঠে আসে, হায় হায়.... দ্যাখছ কান্ড... দ্যাখতে দ্যাখতে বচ্ছর ঘুইর‍্যা গেল.... অহনো নি ফেরার নাম আছে। কই গেল ক তো?

বউটির গলা রুদ্ধ হয়ে আসে। চাপা কান্নায় কোনোরকমে জানায় সে, কী কইর‍্যা কমু কন! কইয়া তো যায় নাই?

আইচ্ছা, একবার আহুক হেয়.... চউখ গ্যালে কী হয়... বাইচ্যা তো থাকুম আরও অনেক দিন—

থাউক না বাবা! বউটির চোখ ফেটে জল গড়িয়ে নামে। আর ওই তখনই বুড়ো গজরায়, থাকব ক্যান! ক্যান থাকব? আমার না হয় তিন কাল গিয়া এক কাল ঠেকছে। কিন্তু তর কথাটা একবারও ভাবব না!

বলতে বলতেই বুড়োর গলায় তুমুল কাশি। কাশতে কাশতে দম যেন বন্ধই হয়ে আসে একরকম।

বউটি সঙ্গে সঙ্গে তৎপর। একটা পাল্লা খুলে মুখ একটু ঢুকিয়ে কথা বলছিল। বুড়ো মানুষটার কাশি দেখে মুহূর্তেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চটপট বুড়োর সামনে বসে কম্বল তুলে হাত বাড়িয়ে বুকটায় মালিশ করতে শুরু করল। করতে করতে কাশি একটু কমতেই সে কম্বলটা টেনে দেয় বুড়োর বুকের কাছে। একদম গলার কাছে বাধা কণ্ঠির মালা পর্যন্ত। পরে বলে, কাইল সন্ধ্যায় রসুন ত্যাল মালিশ করনে দ্যাখছেন কাশ কত নরম হইয়া আইছে। আপনে তো মাখতে চাইছিলেন না?

গলার ভেতরে শব্দটা তখনও মৃদু ঘর্ঘর করছিল। সেটা সামলে একসময় চোখ তোলে বুড়ো, রসুন নি আমরা ঘরে আনি?

আহা, এইডা তো ওষুধের লাখান। খাইতে তো আছেন না। দ্রব্যগুণ আছে বইল্যাই লইয়া আইছি। যাউক গিয়া অহনে শুইয়া থাকেন। কুয়াশ একটু কমলে বাইরে নাহয় নিয়া যামু—

আইচ্ছ্যা—চুপ করেই ছিল বুড়ো একটু পরেই আবার বলে, কোনও সংবাদই পাইলি না অহনও—না?

বউ বোঝে বুড়ো আবারও তার ছেলের কথায় ফিরেছে। কিন্তু এ কথার কী উত্তর দেবে সে। সে নিজেই তো জানে না ভালো করে। শুধু এটুকু জানত, বরটা ওর রহস্যময়। সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোয় কিন্তু বেলা পড়ল কী বেরোল বাইরে। সঙ্গে ওই মোপেটটা। গাগা করে স্টার্ট দিয়ে তাতে চড়ে সেই যে বেরোত ফিরতে ফিরতে প্রায় মধ্যরাত। প্রথম প্রথম অবাক হয়ে যেত পারুল। মনের মধ্যে নানা রকম প্রশ্নের ঢেউ উঠত। মানুষটা যায় কোথায়? তাছাড়া

করেই বা কী! বিয়ের পরে পরে দু'একদিন জিজ্ঞেস করায় বলেছিল বিজনেস। ব্যবসা করে সে। কিন্তু কী এমন ব্যবসা যে সে ব্যবসার কাজে রোজই তার রাত গড়িয়ে যায়।

কৌতূহল ছিল পারুলের। কিন্তু কৌতূহল থাকলেও জিজ্ঞেস করতে ভয় পেত। তাছাড়া সবে বিয়ে হয়ে এসেছে। আর এমন এক সংসারে যেখানে শাশুড়ি নেই। শ্বশুর আর দুই ছেলেমেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে অনেকদূর। পতিরামপুর। তা সে মেয়ে বছরে একবারও আসে কিনা সন্দেহ। ফলে সংসারটা উঠল পারুলের হাতে। আর শ্বশুরও তা তুলে দিয়েছিল আনন্দে। কিন্তু এ আনন্দ আর বেশিদিন রইল না। ইতিমধ্যে পেটে বাচ্চা এসে গিয়েছিল পারুলের। কিন্তু জন্ম দেবার পরেই জানতে পারল বাচ্চাটা মরা। পারুলের মুখে তখন অন্ধকার। মনে আতঙ্ক আর উঠতে বসতে মনের ভেতরে কষ্ট একটা। ভেঙেও পড়েছিল যেন। কিন্তু ভাঙতে দিল না আবার ওই শ্বশুরই। নানান কথায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে আবার সংসারেই ফিরিয়ে আনল ওকে। তবে শ্বশুর ফেরালেও স্বামী স্বজনের এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। সে যেমন ছিল তেমনিই রইল তার জীবন-যাপনে। যায় বিকেলে ফেরে মধ্যরাতে। তারপর ঘুম। একদিন পারুল লক্ষ করেছে, তার পা টলছে দেহ কাঁপছে। মোপেটটা রেখে কোনোরকমে সে ঘরে ঢুকছে। কিন্তু ঢুকেও পারছে না ঢুকতে। দরজাটাই পাচ্ছে না খুঁজে। অগত্যা এগিয়ে যায় পারুল। চট করে গিয়ে ধরে ফেলে। কিন্তু। ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়েই টের পেয়েছিল মানুষটার মুখে নেশার গন্ধ। পারুল চমকে উঠেছিল। স্বজনকে বিছানায় তুলে দিতেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘুমোতে পারেনি পারুল। বাকি রাত আর দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। ভয়ে আর দুশ্চিন্তায় প্রায় জেগেই কাটিয়ে দিয়েছিল। পরে ভোরে উঠে শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করলেও শ্বশুর ঠিক উত্তর দিতে পারেনি। প্রায় পালিয়েই গিয়েছিল যেন।

গ্রামের একধারে রাস্তার পাশেই একটা মুদি দোকান ছিল তার শ্বশুরের। একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ই রাজাকারদের হাত থেকে কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে বর্ডার পেরিয়ে এদিকে চলে আসে সে। এসে পঞ্চায়েতকে ধরে টরে ভিটের একটা ব্যবস্থা করে। আর সেইসঙ্গে নিজের চেষ্টায় এদিকওদিক করে ওই ছোট্ট দোকানটি।

দোকানটা নিয়েই থাকত নিত্যপদ। আর সন্ধের পরে দোকান বন্ধ করে ঘরে এসে ঠাকুরের নামগান। গলায় সুর ছিল নিত্যপদর। তাই নিয়েই হরি-সংকীর্তন। গ্রামের লোকজনও তাই তাকে আপন করে নিয়েছিল। সন্ধের

পরে এদেরই কেউ কেউ এসে বসত নিত্যপদর ভিটেয়। নিত্যপদর গলায় নাম সংকীর্তন শুনত। এভাবেই চলছিল। কিন্তু একদিন আর চলল না। উদরিতে ধরেছিল বউকে। বউ গেল মরে। আর বউ মারা যাওয়ার পরে সংসারটাও যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। তবু ওরই ভেতরে একদিন মেয়ের বিয়ে দিল নিত্যপদ। এবং এরপরেই একটু একটু করে কানে আসতে লাগল ছেলের কথা। ছেলে কীসের ব্যবসা চালায় বর্ডারে। ছেলেকে বলায় ছেলে জানিয়েছিল, ব্যবসা নয় একরকম দালালেরই কাজ করে সে। বর্ডারে ট্যুরিস্ট এলে তাদের ধরে ধরে মানি এক্সচেঞ্জারদের কাছে নিয়ে যায়। বিনিময়ে তারা কিছু কমিশন দেয়।

এইভাবেই চলছিল। কিন্তু একদিন যেন শুনল অন্যরকম। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার এপারে দাঁড়িয়ে চোরাই চালানের ব্যবসায় নেমেছে স্বজন। নিত্যপদ সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিল একদিন। কিন্তু শুনে ছেলে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। সন্দেহ তবুও যায়নি নিত্যপদর। তাছাড়া শোনেও যেন নানারকম। নানান কথার শেষে সন্দেহটা দৃঢ় হয় ছেলে বাহনে চড়াতে। দু চাকার একটা গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ছেলে। আর যত ভাব-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব নাকি সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে। কিন্তু কী এত কথাবার্তা ওদের সঙ্গে!

ব্যাপারটা ভালো লাগেনি নিত্যপদর। ভালো চোখে দেখেওনি ছেলের ওই পরিবর্তন। ফলে নিজের ভেতরেই গুমরে মরেছিল। অতঃপর শেষ চেষ্টা হিসেবে খুঁজে পেতে পারুলকে নিয়ে আসা। পারুলর সঙ্গে বিয়ে। কিন্তু তাতেও কি শোধরাল ছেলেটা! সে তার নিজের মতোই তখনও। এভাবেই কাটছিল। কিন্তু একদিন ,আর কাটল না। এক সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনল, ছেলে আর ফেরেনি বাড়িতে। এমনি একদিন দুদিন। এরপর সপ্তাহ ঘুরে মাস। মাসের পর বছরও ঘুরে এল। ছেলে আর ফেরে না। ইতিমধ্যে নামসংকীর্তন বন্ধ হয়েছে। দোকানেও যায় না নিয়মিত। যদিও-বা গেল চুপচাপ বসে রইল। এমনি বসতে বসতে একদিন কী যে হয় ফেরার সময় আচমকা রাস্তায়ই মাথা ঘুরে পড়ে যায় নিত্যপদ। গাঁয়ের লোক ধরাধরি করে দিয়ে যায়। আর এরপরেই দু-একদিন বাদে ধরা পড়ে চোখ তার ঝাপসা। কিছুই আর দেখছে না সে। পারুল তবু একে-তাকে ধরে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল। কিন্তু তাতে সুবিধা হয়নি। আস্তে আস্তে এরপর একদিন বিছানা নিল নিত্যপদ। আর বিছানায় শুয়ে শুয়েই একদিকে যেমন ছেলেকে গালাগাল অন্যদিকে আবার ছেলেরই প্রতীক্ষা। ছেলেরই জন্য অপেক্ষা।

অপেক্ষায়ই ছিল নিত্যপদ। কিন্তু উত্তর না পেয়ে এবারে ছেলেকেই গালাগাল, হারামজাদা....বজ্জাত....আসুক একবার সে!

কিন্তু কে আসবে! পারুল শুনেছে সে আর নেই। চোরাকারবারের অন্ধগলিতে ঘুরতে ঘুরতে সেই অন্ধকারেই একদিন হারিয়ে গেছে। সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে ভাববোঝাপড়া ছিল। কিন্তু তাদের গুলিতেই নাকি আবার মরে সে। তবে মরলেও স্বজনের বডি পাওয়া যায়নি। আবার তাকেই যে গুলি করা হয়েছে তাও কেউ জোর করে বলতে পারেনি। অতঃপর বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝে সিঁদুর মুছল পারুল, তবে হাতের নোয়াটা রাখল। শাঁখা থাকল না কিন্তু পরনে রইল রঙিন শাড়ি। রইল অজানা এক আশায় যদি হঠাৎ কখনও চলে আসে ঘরের মানুষটি।

পারুল উঠল। আর উঠতেই খেয়াল হল। বারান্দার খুপরিতে ভোররাতেই একটা লোক ঢুকে বসে আছে। কে ওই লোকটা? নাম বলল রাশেদ। কিন্তু স্বজনের সঙ্গে এত মিল। সেই দশাসই চেহারা। সেই টানা টানা ডাগর দুই চোখ। পারুল তো দেখেই চমকে উঠেছিল। মুখটা চেপে ধরায় চিৎকার হয়তো করতে পারেনি, আবার তাকিয়ে বুঝি চোখও ফেরাতে পারেনি। কিন্তু কে, কোথা থেকে এল লোকটা! কোথায়ই বা যাচ্ছে!

উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা টেনে দিয়ে আবার পারুল এগোল।

ছয়

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল রাশেদ। আর দেখতে দেখতেই অবাক একরকম। খুপরি ঘরটায় যে কত রকমের জিনিস। কুলো-চাটাই-হাতপাখা থেকে তোলা উনুন ও গুল-কয়লার বস্তা। এছাড়া ছেঁড়া ন্যাকড়া ও পাটি একটা। পাটিটা দাঁড় করানো ছিল। কিন্তু পাশে স্তূপীকৃত কিছু মাটি দেখে অবাক হল রাশেদ। আরও অবাক হল ওই মাটির স্তূপের পাশেই কাঁচা মাটির কিছু পুতুল বানানো। বানিয়ে সার দিয়ে রাখা হয়েছে। আর ভঙ্গীও ভারী চমৎকার পুতুলগুলির! যেন কোথাও যেতে যেতে তারা পরস্পর কথা বলছে। দলে বাচ্চা থেকে বুড়ো, নারী থেকে পুরুষ সবাই-ই আছে। কাঁধে ও কোলে তাদের তল্পি-তল্পা ও বোচকা-বাচকি। এরই মধ্যে হাত তুলে দু বাহু শূন্যে রেখেই নৃত্যরত ভঙ্গিমায় এক গৌরবর্ণ পুরুষ। মাথায় তারই মতো ঝাঁকড়া চুল। পেছনে খোল-করতাল হাতে আরও দুজন। কিন্তু এই মূর্তিগুলি রঙ করা। সবে রঙ করা হয়েছে। কেননা পাশে রঙ-তুলির পাত্রও দেখল রাশেদ।

কিন্তু কে করে এসব মূর্তি! কে বানায়?

ঘরে কুয়াশা ছিল। ঘুরছিল এখনও চুলার ধোঁয়ার মতো। ফলে পরিষ্কার সব কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তবু এখানে ওখানে চোখ রাখাতে একটা দুটো

জিনিস আবিষ্কার করে ক্রমশই অবাক হচ্ছিল রাশেদ। এসব কে বানায়! বউটি কি? কিন্তু বানিয়ে—

পুতুল একটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিল, এই সময়েই খুপরিতে ঢুকল এসে পারুল। ঢুকেই বলল,

বেলা বাড়তে আছে কিলাম। বাড়লেও কুয়াশ কমব না তয় পাতলা হইতে শুরু করব। তহনে আর এই খুপরিডায় থাকন যাইব না। ধরা পইড়া যাইবা।

তইলে? রাশেদ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

গলা নামিয়ে পারুল জানায়, পিছনে একটা ছুটো ঘর আছে আমাগো। পাকঘরের পাশে। ওইহানে থাকতে পারো। কেউ ট্যারও পাইব না।

কিন্তু! ফিসফিস করে বলে রাশেদ।

এপাশে ওপাশে তাকিয়ে গলা আবারও নামায় পারুল, কী অইল?

না কিছু হয় নাই... আমারে তুমি চিনো না জানো না..... কী মতলব লইয়া ঢুকছি তাও জানো না—

তয় আর কী, পইড়্যা থাকো এইহানে। তারপর ধরা পইড়্যা যাও—

না না, তা কই না।

তয় কী কও! কইয়া ফালাও। পারুল বড় অস্থির। চাপা গলায়ই জানায়, কে কইত্থিকা দেইখ্যা ফালায়—

রাশেদের গলায় করুণ মিনতি, আমারে তুমি ধরাইয়া দিও না। বৈকাল পড়লেই যামু গিয়া কইলাম। বিশ্যাস যাও—

হাসি এসে গিয়েছিল পারুলের। ফিক করে হেসেই সে এবারে সতর্ক। একবার এপাশে ওপাশে তাকিয়েই ভেজা কাপড়ের বালতিটা তুলে নেয়। নিতে নিতেই বলে,

এত ডর লইয়া বর্ডারে ঘোরো ক্যান! মাইয়া-মাইনষের লাখান ঘরে বইয়া থাকলেই পারো!

রাশেদ হাসে শব্দ না-করে, ঘর থাকলে তো বসুম—

ঘর নাই—!

পারুল অবাক। রাশেদ মাথা নাড়ে, না নাই—

তয় থাকো কই?

যেহানে যহন ঠাই পাই—রাশেদ আবারও হাসে নিঃশব্দে, ঘর নাই ভিডা নাই দ্যাশ নাই কাম নাই। কামের সন্ধানেই তাই ঘুরি। একবার এই পাড়ে এউকবার অই পাড়ে। কিন্তু বইতে দেয় না কেউই। কামে গিয়া বইলেই ধরা পইড়্যা যাই। ওই তহনি কাউয়ার মতো খেদানি। মুখের ভাতও কাইড়্যা লয়।

জানো, কাইল কী হইছে!

বলতে বলতে রাশেদ জানায় গতকালের ঘটনা। বিস্তারিত সবই বলে। এবং বলতে বলতে আস্তে আস্তে ভেসে পড়ে সেই কোন শৈশবে।

পারুল বসে পড়েছিল। হাঁটু ভেঙে বসেই শুনছিল কৌতূহল নিয়ে, এই সময়েই বাইরে কার গলা।

অ পারু—

মুহূর্তেই চমকে ওঠে পারুল। সঙ্গে সঙ্গে রাশেদও চাদরটা আবার মাথায় তুলে নিজেকে আড়াল করে। করেই খুপড়ির আরও কোণে সরে যায়।

পারুল উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই আবার দাওয়ার সামনে।

কে—অ সদু পিসি! তা তুমি এই সাত সকালে উইঠ্যা আইলা?

সকাল আর কই! বেলা বাড়ছে অনেক। কুয়াশ লাগায় বোঝন যায় না। হোন, কাইল আমার ছুটো বুইন খবর পাঠাইছে। দিন দুই বাদে আইয়া কুলা আর পিড়ি লইয়া যাইব। বিয়ার তো আর দেরি নাই। তর কাম হইয়া গেছে তো?

হ পিসি। রঙ চড়াইয়া দিছি। আইজ চিত্তির কইর‍্যা দিলেই হইয়া যাইব।

কেমুন অইব ক তো?

তোমরা দেইখ্যা লইও—

আমরা কী দেখুম.... তুই করছস—

বুড়ি হাসে ফোকলা দাঁতে। হাসতে হাসতেই এরপর ভুরু কোঁচকায়, তা হ্যারে। আইজ নিকি তলাপোড়ারা ঢুকছিল পাড়ায়?

হ পিসি। পারুল চমকে ওঠে। সন্তর্পণেই বলে এরপর, কাইল নিকি বেড়া টপকাইয়া মানুষ ঢুকছে!

বাপরে বাপ। চক্ষু বটে তলপোড়া গো। এমুন কুয়াশেও ঠিক দেইখ্যা ফালাইছে। তা ধরা পড়ছে?

বুক কেঁপে ওঠে পারুলের। মাথা নেড়েই সে জানায়, কী জানি কইতে পারুম না—

ঠিক আছে অহনে যাই। অরা আইব কিলাম দিন দুই পর।

হ হ, আইতে কও না—

দাওয়া ছেড়ে নীচে নেমে বুড়ি হাঁটে আবার কুয়াশার ভেতরে আর ওই তখনই পারুল ফিরে আসে খুপরির এদিকে। লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে, শিগগিরি চল। নইলে বিপদ আছে কইলাম। তয় খুব সাবধান। পা টিইপ্যা টিইপ্যা আমার পেছনে পেছনে আইবা। হউরের চক্ষু নাই কিন্তু কান বড়

সজাগ। খাড়াও একবার দেইখ্যা লই—

বালতিটা হাতে নিয়ে খুপরি থেকে বেরিয়ে যায় পারুল। ফিরে আসে আবার খানিক বাদে।

লও চল—

কথাটা রাশেদের উদ্দেশে। রাশেদ তাই ভয়ে ভয়েই ওঠে। উঠে পারুলের পেছনে পেছনে হাঁটে। পা টিপে টিপে হেঁটে একসময় পেছনের দিকের প্রায়ান্ধকার একটা ঘরে গিয়ে ওঠে।

নাও, এইহানে থাক অহন। এইহানে ভয় নাই। আমি তোমার লাইগ্যা মুড়ি লইয়া আসি একটু—

না না, মুড়ি লাগব না।

রাশেদ বাধা দিতেই পারুল হাসে, তয় কাইল রাতের ভাত আছে একটু। লইয়া আহি—

না না। রাশেদ বাধা দেয়, খাওন লাগব না। আমি খামু না।

ক্যান, খাইবা না ক্যান। যা হুনাইছ, তাতে কাইল থিকা তো পেটে এউগা দানা পড়ে নাই—

হেইয়া আমার অভ্যাস আছে—

না না, হেইয়া কইলে অইব ক্যান! তুমি বহ। আমি লইয়া আহি—

বলতে বলতে পারুল হাওয়া। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

আর বেরোতেই রাশেদের নজরে পড়ে ছোটো হলেও ঘরখানা মন্দ নয়। একপাশে নীচু একটা সস্তা কাঠের তক্তাপোশ। আর তক্তাপোশের নীচে এখানেও বাইরের ওই খুপরি ঘরের মতোই অজস্র পুতুল। সেই সঙ্গে ফুল লতা ও আলপনায় চিত্রিত নানা ধরনের কুলো ও পিঁড়ি। আধো-অন্ধকারে সেভাবে স্পষ্ট না হলেও দেখা যাচ্ছিল তা এখানে ওখানে। এছাড়া অন্যদিকের গোবর লেপা মাটির মেঝেতে কিছু এনামেলের হাড়ি-কড়াই-সসপ্যান। ভাঙা ঝুড়িও উল্টে আছে দুটো। ঝুড়ির পাশে একটা আস্ত ফুলকপি।

তাকাতে তাকাতে একসময় তক্তপোশটার ওপরে উঠে বসেছিল রাশেদ। আর বসতেই সারা শরীরে ক্লান্তি। চোখ যেন ঘুমে জড়িয়ে আসছে। এপাশেওপাশে চোখ রাখতে রাখতে কখন একটু কাত হয়েছিল। আর হতে না হতেই দুচোখে প্রবল ঘুম। চোখ বুজে কখন যে ঘুমে ঢলে পড়ল বুঝতেও পারল না। টের যখন পেল একটু তখন চারপাশে দাঁড়িয়ে কারা কথা বলছে। বলছে বেশ জোরে জোরেই। রাশেদ চোখ তুলতে গিয়েও তুলল না। সে ততক্ষণে তার কাজটা করে চলেছে। এক গাঁয়ে এক পয়সাঅলা মানুষের

এন্তেকাল ঘটেছে। তার ছেলে রাস্তায় কামলার খোঁজে বেরিয়ে রাশেদকে পেয়ে ধরে এনেছে। কবর একটা কাটতে হবে। কিন্তু অতবড় দশাসই শরীরের কবর চারশো টাকার কমে কেউ রাজি হয় না। অতঃপর আলটপকা রাশেদকে পেয়ে সে ধরে আনে। এবং মাত্র একশো টাকায়। টাকার কথায় রাশেদ খুশি। কোদাল চালিয়ে সে কবরটা খুঁড়ে ফেলল একাই। কিন্তু খুঁড়ে যখন উঠতে যাবে ওই তখনই ফিসফাস। চাপা গলায় কারা যেন কথা বলছে গর্তের ওপরে। কবরের গর্তের নীচ থেকে চোখ তুলেছিল রাশেদ। আর তুলতেই চোখে পড়েছিল সেই পয়সাঅলা মানুষের পোলাডা। গর্তের ওপরে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে তাকে কী বলছে। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আরও কয়েকজন। রাশেদ শুনল।

বাহ্ হইয়া গেল! তুই তো জব্বর কাম করস। আমগো এইহানের দুইডা কামলা মিলল্যাও এতক্ষণে এই কবরটা কাটতে পারত না। তর কামডা য্যান মইষের লাখান—

বলতে বলতে শার্টের পকেট থেকে দু দুটো একশো টাকার নোট বার করে রাশেদের চোখের ওপরে নাচায় ছেলেটি।

এই দ্যাখ। তর ট্যাহা আমি হাতে লইয়্যা আইছি। একটা নয় দুইডা নোট দিমু তরে। বাপরে বাপ, কী কাম করস রে। এইয়া একশো ট্যাহার কাম না—

বলতে গিয়ে এবারে সে শুধোয়, তা তর নাম কি? নামডা তো জানা অইল না—

আমার নাম রাশেদ। কবরের গর্তের নীচে দাঁড়িয়ে উত্তরটা আকাশে ছোঁড়ে রাশেদ।

. ছেলেটি শুধোয়, রাশেদ কী—

রাশেদ রহমান।

তা হেইডা তো কইতে হয়। হুদু রাশেদ কইলে অয়!

কী করুম! মাটি মাখা কাদা হাতে পিঠ চুলকাতে চুলকাতে রাশেদ জানায়, আমারে হগলেই হুদু রাশেদ কয়। কয় রাশেইদা.... তাই কেউ জিগাইলে অই রাশেদই কই—

তা তর বাড়ি কোনহানে?

রাশেদ চুপ এ কথায়।

লোকটি শুধোয়, আমাগো জিলায় নিকি?

রাশেদ চুপ।

লোকটি বলে আবারও। জিজ্ঞেস করে, কী রে কোন জিলা?

এবারেও চুপ রাশেদ।

কী অইল.... রা কাড়স না যে—

রাশেদ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ওই তখনই গর্তের ওপর থেকে কে ঝুঁকে পড়ে নীচে, ও মিলনবাই, এইডা কারে তুমি ধইরা আনছ! আরে এইডা তো হেই কামলাডা!

কোন কামলা?

ওই যে... যার ভিডা নাই—

তয়! ছিল কোনহানে?

কোনো হানে না।

হেইয়া কী?

হ। জিগাও না অরে। অর ঘর নাই ভিডা নাই জিলা নাই দ্যাশ নাই....

হায় হায় তর দ্যাশ নাই! দ্যাশ না থাকলে থাকবি কোনহানে?

ক্যান ওই কবরে! কে বলে।

কবরে! বলতে না বলতেই হি হি করে একটা চওড়া হাসি। আর তারপরেই হঠাৎই কী হয় ঝুরঝুর করে মাটি। মাটি পড়ছে ওপর থেকে। রাশেদ চমকে ওঠে। ভয় পেয়ে যায়। আতঙ্কে তার মুখ নীল। গলা বুজে আসে। না না, গোর দিও না। আমারে গোর দিও না। রাশেদ বলে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। গর্তের ভেতরে হুড়মুড় করে শুধু মাটি নামতে থাকে। নামতে নামতে পা ঢাকে হাঁটু ঢাকে কোমড় ঢাকে বুক ঢাকে। আর বুক ঢেকে যখন চোখমুখও ঢেকে যাবে ওই সময়েই চিৎকার রাশেদের। কিন্তু চেঁচাতে গিয়েই টের পেল গলা থেকে আর শব্দ বেরোচ্ছে না। বেরোবে কী, গলাটাই যেন ঢেকে যাচ্ছে মাটিতে। রাশেদ লাফিয়ে ওঠে। আর ওই উঠতে গিয়েই কীসের সঙ্গে তার হাত ঠেকে যায়। ঠেকতেই ঘুমটা ভেঙে যায় রাশেদের। রাশেদ দেখে প্রায়ান্ধকার একটা ঘরে তক্তাপোশের ওপর সে শুয়ে আছে। কিন্তু আশেপাশে কেউ নেই। কোথায়ও কারো গলার শব্দ কানে আসছে না। রাশেদ বুঝল ঘুমের ভেতরে সে স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। উফ্—কী স্বপন রে বাপ! স্বপ্নটা এখনও যেন মাথার ভেতরে জড়িয়ে রয়েছে।

রাশেদ তক্তাপোশ থেকে নেমে দাঁড়ায়। দাঁড়াতেই চোখে পড়ে একটা জানালা। তবে জানালাটা বন্ধ। রাশেদ বুঝতে পারল না ওটা খোলা যায় কিনা! খুললে অন্তত বুঝতে পারত বাইরের অবস্থাটা। কুয়াশাটা এখনও আছে কিনা!

কী ভেবে রাশেদ এগোল।

জানালার টিনের পাল্লার একটা অংশ ভাঙা। মরচে ধরে ভাঙতে ভাঙতে জায়গাটা গর্ত মতো হয়ে আছে। ওই গর্ত দিয়েই বাইরের এক ফোঁটা আলো

ঠিকরে আসছে। রাশেদ চোখ রাখল সেই ভাঙা জায়গাটায়। চোখ রেখে তাকাল বাইরের দিকে।

বাইরে এখন আর কুয়াশা নেই। আকাশের নীল রঙ উঁকি মারছে। তাতে দুটো একটা চিল। অদূরে কিছু ঝোপঝাড় জঙ্গল। কিছু ছোটো-বড়ো গাছ। ওরই ভেতরে জঙ্গলের ওপারে একটা গাছ বড় অবাক করে দিল রাশেদকে। যেমন বড় তেমনি ঝাঁকড়া। এমন একটা গাছের শেকড়েই না হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল কাল রাতের অন্ধকারে সে! এতদূর থেকে শুধুমাত্র এই জানালার ফুটোয় চোখ রেখে দেখা না গেলেও রাশেদের চোখে ধরা পড়ল কিছু পাখি। গাছের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে তারা উড়ে যাচ্ছে ওই ওদিকে, যেদিকে আছে সেই পঁচাশি পিলার ও তারও পরে ওই কাঁটাতারের বেড়া। হয়তো বেড়া পার হয়ে তারা উড়ে যাবে আরও দূরে কোনো নদী কিংবা বিলের ধারে। আবার একসময় ফিরেও আসবে।

তন্ময় হয়ে দেখছিল রাশেদ হঠাৎই চমকে উঠল। বুড়ো কাশছে ও ঘরে। আর এরপরেই যেন গলা উঠল, বউ—অ বউ—।

সাত

কুয়াশা কেটে যাচ্ছিল হুড়মুড় করে। আর ওই তখনই আকাশে রঙ ফুটল। রোদও ছড়িয়ে পড়ল গা-গঞ্জের বুকে। তবে এই রোদের আয়ু বড় সীমিত। গায়ে লাগিয়ে উত্তাপ নিতে না নিতেই ফস করে কখন কর্পূরের মতো হাওয়া। ফলে ওই যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই শরীরে শুষে নেওয়া।

শুষে নিতেই বাইরে এসে বসেছিলেন হরপ্রসাদ। এই সময়েই পেছনে জোড়া বুটের শব্দ। সীমান্তরক্ষার দুই প্রহরী। রাইফেল হাতে হাঁটতে হাঁটতে একসময় একেবারে হরপ্রসাদের পিঠের ওপরে।

হেই— কোন বাড়ি আছে এধারে তুমার?

হরপ্রসাদ চোখ বুজেছিলেন। বয়সকালের চোখ। বুজে থাকলে মাঝেমাঝে যেন টের পাওয়া যায় পেছনের ছবি। ঘুরে ফিরে আসছে। আসছিলও তাই। কখনও মধুমতী কখনও আড়িয়াল খাঁ কখনও বা আবার পদ্মা। ওই তো দেখা যাচ্ছে মাঝিমাল্লাদের নৌকা। গয়না, পানসি, টাপরিয়া, দু মাল্লাই, বাতালি। ওই সেই ধু-ধু করা চিকচিকে বালির জেগে ওঠা চর। চরের ভূমি। পাখি উড়ছে সেখানে। আজ না হোক কাল, কাল কিংবা পরশু আসবে জমিদারের লোকজন। মাপামাপি শুরু করবে রশির ক্রমিক সংখ্যায়। পত্তন হবে এরপর কত যে রশি। সাতরশি নয়রশি বারোরশি। ওই তো সামনে আমবাগান পেছনে খোলা মাঠ।

মাঠের এপাশে ডাক্তারখানা। পুকুরঘাটের আড্ডা। বিকেল হতে না হতেই সেখানে এসে জড়ো হচ্ছে অনেকেই। আড্ডা জমছে। আলোচনা হচ্ছে। কখনও ফ্যাসিবাদ, হিটলারের আগ্রাসন। কখনও যুদ্ধ, জাপানি বোমা, নেতাজী সুভাষ, আজাদহিন্দ বাহিনী। আর এরই মাঝেমাঝে নেহরু-জিন্না, জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্ব, দাঙ্গা ও দেশবিভাগ। বুড়ো চোখ। বড় বেশি ছায়া ফেলে পেছনের দিনের। অতীত স্মৃতির। হরপ্রসাদ তাই ডুবেই যাচ্ছিলেন এমনই সময়ে জোড়াবুট।

হেই বুঢ্‌ঢা—

হরপ্রসাদ চোখ খোলেন। আর খুলেই কী বোঝার চেষ্টা করেন।

তোমার কোন বাড়ি আছে?

হরপ্রসাদ অদূরে আঙুল তোলেন। কাঁঠাল গাছের ছায়ায়, ঘোরানো বারান্দার একটা ছোটো বাড়ি। মেঝেটা লেপাপোছা। গোবর নিকোনো। সেখানে মাদুর বিছিয়ে শেষ দুপুরের ঠিকরানো রোদে চাদর গায়ে দুই মহিলা। একজন আর একজনের চুলে চিরুণি তুলেছে।

আঙুল তুলেছিলেন হরপ্রসাদ। নামাতেই রক্ষী দুজনের একজন বলল রাইফেলটা মাটিতে ঠেকিয়ে, কাল রাত মে এক আদমি ঘুষা ইধর। ঘুঁসপৈঠিয়া। দেখা তুম?

হরপ্রসাদ মাথা নাড়েন, নাহ দেখি নাই তো?

দেখলেই খবর দেবে। এ গাঁয়েই ঢুকেছে কাল রাতে—

হরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করেন, কাইল ঢুকছে!

হ্যাঁ। বিএসএফের চোখে ভ্রূকুটি, কারো ঘরে ঘুষতে দিবে না বলে দিলাম। আমরা ঘরে ঘরে সার্চ করব। পেলে তোমাদেরও ছাড়ব না—

নানা। হরপ্রসাদ চোখ তোলেন, ঢুকতে দিমু ক্যান তয় কেউ যদি রাইতের আন্ধারে ঢুইক্যা পড়ে...

ঢুকলেই হল। বিএসএফের গলায় ক্ষোভ, তোমরা আছ কী করতে?

রাইফেল হাতে তুলে লম্বা পায়ে এগিয়ে যায় দশাসই চেহারার দুই জওয়ান। হাঁটতে হাঁটতে গাঁয়ের ভেতরে ঢুকে যায়।

হরপ্রসাদ উঠে পড়েন। শরীরটা বড় বেগোরবাই করছে কাল থেকে। হাতে-পায়ে ব্যথা। উঠলে যেন কোমর ভেঙে আসে। মাদুর একটা পেতে বসেছিলেন। মাদুরটা গুটিয়ে উঠে দাঁড়াতেই কানে আসে একটা সাইকেলের বেলের শব্দ। হরপ্রসাদ দাঁড়িয়ে পড়েন। আর দাঁড়াতেই চোখে পড়ে নগেন। হরপ্রসাদের সামনে এসে থমকে গিয়েই প্যাডেল থেকে পা একটা নামাল।

কী কয় অরা মাস্টারমশাই? কী কইয়া গেল—

কারা!

ওই যে বিএসএফ।

ও হো। হরপ্রসাদের যেন মনে পড়ে যায়, কাইল নাকি আমগো এইহানে ঢুকছে কোন বাংলাদেশি?

নগেন মাথা নাড়ে, জানি না তো।

আমিও তো হেই কথাই জানাইলাম। হরপ্রসাদ বলেন, কয় কিনা ঘরদুয়ার সার্চ করব বেবাকের—

হঃ। নগেন মুখের সামনে এসে পড়া মাছি তাড়াবার মতো করেই বলে, কাম নাই অহনে এই কইর‍্যা বেড়াক.... কে কই ঢুকছে—

তা অগো আর দোষ দিয়া লাভ কী! এইয়া তো অগো ডিউটির মইধ্যে পড়ে।.... তা তুমি আইজ অহনি চইল্যা আইলা? হরপ্রসাদ প্রসঙ্গ বদলান, আইজ তোমার দোকান খোলো নাই নিকি?

নানা, খুলছি। নগেন জানায়, তয় আগেই বন্ধ কইর‍্যা আইলাম। আইজ আমার আবার বুইনের বিয়ার কথাবার্তা কইতে লোকজন আইব বাড়িতে—

তাই নিকি! হরপ্রসাদের মুখ প্রসন্ন হয়ে ওঠে, খুব ভালো। তা পোলা কী করে! বাড়ি কোনহানে?

বাড়ি তো কাছেই। তয় পোলার চাকরি বালুরঘাটে। কালেকটরিতে--

তয় তো ভালোই চাকরিখান। অহন ভালোয় ভালোয় হইয়া গেলে তুমিও নিশ্চিন্ত—

হেইয়া তো ঠিকই..... কিন্তু নিশ্চিন্ত আর হই কই?

ক্যান, কী হইল আবার? হরপ্রসাদের মুখে জিজ্ঞাসা।

নগেন চুপ। কী ভাবে। সীমান্ত—লাগোয়া ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন অফিসের অদূরে একটা পান বিড়ি সিগারেটের দোকান দিয়েছে নগেন। ভালোই চলে দোকানটা। আর দোকান থেকে যা আয় হয় তাতে চলেও যাচ্ছিল সংসারটা। কিন্তু আর বুঝি চলবে না। আজই খবর পেয়েছে একটা, বর্ডার এলাকায় নাকি পরিচয়পত্র চালু হবে এবারে। তাহলে নাকি অনুপ্রবেশ ঠেকানো যাবে! আরও শুনেছে, একাত্তরের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের আগে পর্যন্ত যারা ওপার থেকে এদিকে এসেছে ওই তাদেরই দেওয়া হবে পরিচয়পত্র। কিন্তু এরপর যাদের আগমন তারা অনুপ্রবেশকারী। তাদের দায়িত্ব আর এদেশের সরকারের নেই। ধরে ধরে চিহ্নিত করে এখন তাদের পাঠানো হবে বাংলাদেশে।

কও কী! শুনে স্তম্ভিত হরপ্রসাদ।

নগেন জানায়, হ মাস্টারমশাই। শুইন্যা তো আমার মাথার চুল খাড়া হয় আর কী—

তইলে! হরপ্রসাদ ফ্যালফ্যাল করে তাকান, কী হইব অহনে?

দুই একদিনের মধ্যেই শুনলাম র‍্যাশন-কার্ড পরীক্ষা করব হগলের—

তা করুক না পরীক্ষা। আপত্তি কিয়ের! হরপ্রসাদের গলায় যেন সাময়িক স্বস্তি, আমগো তো র‍্যাশন-কার্ড আছে হগলের। তোমার নাই.... তোমারও তো আছে—

হ তা আছে। তয় হেয়গুলি নাকি বুয়া। নগেন তাকায় চিন্তিত মুখে।

হরপ্রসাদ চমকে ওঠেন, কী কও তুমি নগেন?

ঠিকই কইতে আছি মাস্টারমশাই। বুয়া র‍্যাশন-কার্ডে আর পরিচয়পত্র দিব না। দিল্লি থিকা নাকি লোক আইতে আছে পরীক্ষা করনের লাইগ্যা—

তইলে! হরপ্রসাদের মুখ শুকিয়ে যায়। উত্তরের হাওয়া বইছিল। হাওয়ার দাপটে চাদরটা গা থেকে খুলে গেলেও হরপ্রসাদের খেয়াল হল না। অসহায় চোখে নগেনের দিকে তাকিয়েই তাই বলেন, কী হইব কও তো নগেন? বুয়া কার্ডগুলিন রে ঠিক করন যায় না?

করুম কেমনে? একাত্তর সনের পরে আসা লোকজনের কার্ডগুলিই নাকি অবৈধ।

ক্যান, অবৈধ ক্যান! হরপ্রসাদের গলায় ভয়।

কয় তো বাংলাদ্যাশ মুক্তিযুদ্ধের পরে ইন্ডিয়ায় আসা লোকজন নিকি ইন্ডিয়ারই নাগরিক হইতে পারে না—

কী কও গো নগেন। তয় যে বোট দিলাম কয়বার?

যা দিছেন দিছেন এইবারে আর র‍্যাশনকার্ড দেখাইয়া বোট দেওন যাইব না। সব জায়গায় পরিচয়পত্র হইয়া যাইতে আছে। আমগো এইহানেও অহনে হইয়া যাইব। পরিচয়পত্র ছাড়া কোনো লোকই আর থাকতে পারব না ইন্ডিয়ায়?

নগেন প্যাডেলে চাপ দিতে যাচ্ছিল ডান পা-টা তুলে। হরপ্রসাদ সামান্য এগিয়েই নগেনের সাইকেলের হ্যান্ডেলটা ধরে ফেললেন, তা আমগো পরিচয়পত্র দিতে দোষ কী! অ্যাত্তোগুলি বছর ধইর‍্যা আছি—

হেই কথাডাটা আমিও ভাবি। নগেন মাথা নাড়ে, কিন্তু একাত্তর সনের পরে আসা লোকেরে অরা পরিচয়পত্র দিব না কইতে আছে।

বলতে বলতেই প্যাডেলে পা তোলে নগেন, ঠিক আছে অহনি ভাইঙা পড়নের কিছু নাই মাস্টারমশাই। সমস্যাডা যখন হগলের, একটা কিছু ঠিক হইবই। আমি আপনারে জানামু—

হ। জানাইও কিন্তু বাবা—

বলতে বলতে হরপ্রসাদ আবার চোখ তোলেন, আইচ্ছা নগেন আর-একখান

কথাও জিগাই তোমারে—

কী কথা মাস্টারমশাই! প্যাডেলে পা তুলে দিয়েছিল পা-টা নামিয়ে আবার সাইকেলে ভর দিয়ে দাঁড়ায় নগেন। হরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করেন, কুন সংবাদপত্রে য্যান পড়লাম বাংলাদ্যাশ সরকার নিকি অহনে হিন্দু গো সম্পত্তি ফিরৎ দিব কইছে—

হ হ পড়ছি। সংবাদটা আমারও চোখে পড়ছে। তয় ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় নাই। এই লইয়া এক একজন একএকরকম কয়। ব্যাপারটা কী কন তো মাস্টরমশাই?

হরপ্রসাদের গলায় শ্লেষ্মা জড়িয়ে গিয়েছিল। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে তিনি বললেন। বুঝিয়ে বললেন নগেনকে। আর তিনি যা জানালেন তা এরকম।

১৯৪৭-এ দেশভাগের পর দাঙ্গা, সন্ত্রাস ও নির্যাতনের কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দু জীবন ও সম্ভ্রম বাঁচাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তাদের যাবতীয় সম্পত্তি ফেলে রাতারাতি পালিয়ে আসতে থাকে। এক কাপড়ে উদ্বাস্তু হয়ে তারা ইন্ডিয়ায় এসে আশ্রয় নেয়। উনিশ শো পঁয়ষট্টি সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর পাকিস্তান সরকার এঁদের সম্পত্তিকে 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে চিহ্নিত করে। করে তা দখলের জন্য বিতর্কিত 'শত্রু সম্পত্তি আইন' প্রণয়ন করে। উনিশ শো একাত্তর সালে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠার পরে শেখ মুজিবর রহমানের সরকার সেসব সম্পত্তি ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেন। এবং এ-বিষয়ে নতুন আইন তৈরির প্রক্রিয়াটা নিয়েও ভাবনাচিন্তা শুরু হয়।

নগেন শুনছিল। শুনতে শুনতেই কী বলতে যাচ্ছিল সে কিন্তু আর বলল না। প্রশ্নটা মনে ধরে রেখেই সে তাকাল আবার হরপ্রসাদের দিকে। হরপ্রসাদ তখনও মনে করে করে বলছেন সংবাদপত্রেই পড়া ওই বিষয়টির কথা।

কিন্তু আইন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হলে হবে কী উনিশশো পঁচাত্তর সালে শেখ মুজিবের হত্যাকান্ড ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে সে প্রক্রিয়া থমকে যায়। এরপর বিএনপি ও জাতীয় পার্টি পরপর কয়েকবার ক্ষমতায় এসেও সরকার গঠন করলেও বিষয়টি নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি। শত্রু সম্পত্তি আইন সংশোধন ও হিন্দু-সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে উনিশ শো ছিয়ানব্বই সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামি লীগ ক্ষমতায় আসে। কিন্তু সরকারে এসে এ-বিষয়টি নিয়ে আবার নাড়াচাড়া পড়লেও প্রভাবশালী নানান মহলের বিরোধীতায় তার বাস্তবায়নে টালবাহানা দেখা যায়। অবশ্য একটা কাজ ওই সরকার করে। দুহাজার এক সালে সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁরা 'শত্রু সম্পত্তি'

আইনের নাম পাল্টে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' আখ্যা দেয়। এবং তা ফেরত দেওয়ার জন্য 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন'-ও তৈরি হয়ে যায়। বলা হয় একশো-আশি দিনের মধ্যেই অর্পিত সম্পত্তির একটি তালিকা প্রকাশ করা হবে। কিন্তু করলে হয় কী, দুহাজার এক সালে আওয়ামি লীগ ক্ষমতা থেকে সবে যাওয়ায় সে আইনের প্রয়োগেও আবার ধামাচাপা পড়ে। পরে বিএনপি-জামাত জোট সরকারে এলে ওই আইনে ছোট্ট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ একটি সংশোধন ঘটে। সময়সীমাটি একশো-আশি দিনের পরিবর্তে 'অনির্দিষ্ট কাল' করে দেওয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি আওয়ামি লীগ দুহাজার আট সালে ফের ক্ষমতায় এলে বিষয়টি আবার ভেসে ওঠে। সংসদে আইনমন্ত্রী ঘোষণা করেন, অর্পিত সম্পত্তি আইন সংশোধন ও এ-ধরনের সম্পত্তি চিহ্নিত করে ফেরত দেওয়ার বিষয়ে সরকার নীতিগতভাবে রাজি। সরকারের সদিচ্ছাও রয়েছে। এ-বিষয়ে তারা প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

একটানা বলে আবারও কাশছিলেন হরপ্রসাদ। নগেন তার প্রশ্নটি করল এবারেই, কিন্তু ফেরত দেওনের কথাটা বুয়া মাস্টারমশাই?

ক্যান! হরপ্রসাদ মুখ থেকে একদলা কফ ফেললেন একটু এগিয়ে গিয়েই। পরে ফিরে এসে শুধোলেন, এমুন কথা তোমার মনে অইল ক্যান?

ক্যান অইব না! মুজিবের আমলে এই বিষয়টি নিয়ে তোড়জোড় শুরু অইলেও অখনও দেখেন টালবাহানা... আটত্রিশ বচ্ছর কাইট্যা গেলেও অখনও শুধু এই কথা হেই কথা...কথার কোনো লাগাম আছে...এইয়া অইব না মাস্টরমশাই—

অইব না? হরপ্রসাদ তাকিয়ে থাকে নগেনের মুখের দিকে।

নগেন মাথা নাড়ে, হয় কখনও.... এইডা শুধুই রাজনীতির চমক। হিন্দুগো বোটটা (ভোট) রাখনের লাইগ্যা কয়—

হদুই তাই! হরপ্রসাদের চোখে অনন্ত জিজ্ঞাসা। নগেনের কথা তিনি শোনেন তাই মন দিয়ে। নগেন জানায়, আইচ্ছা একখান কথা কন তো...হিন্দুগো সম্পত্তি-জমিজমা দখল কইরা যারা বাইট বচ্ছর ধইরা রইছে তারা অহনে ছাড়ব ক্যান? যতই আইন করুক আইনের ফাঁকও রাখব...

একটু থেমে নগেন আবার বলে, আরে অতদূর যাওনের কাম কী মাস্টারমশাই। বাংলাদ্যাশ হওনের পরেই আহেন না...বাংলা দ্যাশের সময় আমরা যারা উচ্ছেদ হইয়া আইছিলাম... কইছিল তাগো ঘরবাড়ি ফিরাইয়া দিব...কিন্তু দিতে পারছে...অথচ বঙ্গবন্ধু তো ঘোষণাও করছিলেন বাংলাদ্যাশ গঠনের পর—

না তা হয় নাই।

তয়। আমাগো নিত্যকাকায় তো গেছিল সম্পত্তির পুনরুদ্ধারে...বাংলাদ্যাশ হওনের পর...কিন্তু কী অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরা আইল—

একটু চুপ। একসময় বলে আবার নগেন, কাজেই এইসব বুয়া কথা মাঝেমাঝে ওঠে আবার কপ্পুরের মতো হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। বোটারই (ভোটার) শুধু তপ্ত হইয়া ওঠে মাঝেমইধ্যে। যাউক গিয়া, অহনে যে সমস্যাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এইহানে... দেহি হেডডাই সামলাই আগে হেয়ারপর অন্যকথা—

হরপ্রসাদ চুপ করেই ছিলেন। বললেন এবারে, হ দেখ তইলে। সোময়ে-সোময়ে খবর দিও আমারে...বুড়া হইছি যাইতে আর পারি না কুনোখানে...

নানা, খবর যা পাই জানামু আপনারে। আপনে নিশ্চিন্ত থাকেন—

হ তাই থাকনের চেষ্টা করুম। কিন্তু চেষ্টা করলেও মন কী আর মানে!

নগেন মাথা নাড়ে, নানা হেইয়া কইলে চলব!

সাইকেলের হ্যান্ডেলটা ধরেছিল হরপ্রসাদ আলতো করে। নগেন প্যাডেলে পা তুলল।

হ্যান্ডেলটা ছেড়ে দিয়েই হরপ্রসাদ তাকান তখন বিমূঢ় চোখে। নগেন এগিয়ে যেতেই পরে পায়ে পায়ে হাঁটেন। হাঁটতে হাঁটতেই বুঝি বা আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন। হরপ্রসাদের তখন মনে পড়েছে অনেক কথা। বর্ষা নেমে এসেছে সে সময়। আষাঢ়ের আকাশ জুড়ে কালো মেঘ। মেঘ জমে উঠেছে নদী-নালা থেকে ঘাটা-আঘাটা ও সুলটির আশেপাশে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে নদীর স্রোত। সেই স্রোতেরই চারপাশে আল-বদর ও রাজাকারদের উল্লাস। সঙ্গে তাদের হানাদার বাহিনী। খুঁজে বেড়াচ্ছে গাঁয়ে-গঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের। ঘরে ঘরে ঢুকে তাই সন্ধান চলছে বেয়নটের মুখে। যুবক যে কোনো দেখলেই হল। ধরো তাদের। ধরে কাটো। আর ধরতে যদি না পারো তো যুঁবতী মেয়েদের কী হল? ধর না তাদের। পাওয়া তো যাচ্ছে অনেক। অতএব দখল নাও তাদের। নিয়ে কর ধর্ষণ। ধর্ষণের পাশাপাশি চলবে লুঠপাট ও গৃহে অগ্নিসংযোগ। সকাল-সন্ধ্যায় তাই মর্টারের শব্দ। সাজোয়া গাড়ির আওয়াজ। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তাই উল্লাস ও চিৎকার।

চিৎকার রোজই শোনেন হরপ্রসাদ। উল্লাসের কথাও কানে আসে। কানে আসে মর্টারের শব্দ। ফলে স্কুলে পড়াতে যাওয়া তো দূরের কথা ঘর থেকে যেন বোরোতেও কেউ ভরসা পায় না। ভয় ও আতঙ্কে এভাবেই কাটছিল দিনগুলি। কিন্তু আর কাটল না। এক সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনলেন গাঁয়ে

ঢুকে পড়েছে হানাদার বাহিনী। সঙ্গে ওই আল-বদরের ছেলেরা। হই হই করে জান্তব উল্লাসে ঢুকছে পায়ে পায়ে। চিনিয়ে দিচ্ছে বাড়িগুলো। খবর পেয়েছিলেন আগেই। পেয়েই সকাল আটটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। বেরিয়েই বউ-ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সোজা ওই ধানখেতে। সঙ্গে ওই পাশের বাড়ির নিত্যপদ। নিত্যপদ ও তার পরিবার।

জমিতে ইরিধানের চাষ দেওয়া হয়েছিল। আরও অনেকের দেখাদেখি বাড়ন্ত সেই ধানের গোছের আড়ালেই লুকিয়ে পড়লেন তারা। কিন্তু খবর কী আর চাপা থাকে! ঘরে না পেয়ে পৈশাচিক উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজাকার বাহিনী। হাতে নিয়ে এসেছিল মাছ মারার কোঁচ। ধানের খেতে এসে সেই কোচ মেরে মেরেই মাছের মতো গেঁথে তুলল জনা কয়েক মেয়ে ও শিশু। হরপ্রসাদের পরিবারও বাঁচত না। কিন্তু বাঁচাল ওই নিত্যপদ। কাদা ও জলের মধ্য দিয়ে পাকাল মাছের মতো ওদের ধরে ধরে শুয়ে শুয়েই সরিয়ে নিয়ে গেল আরও অনেকটা দূরে। এভাবেই পড়ে রইলেন সারা সকাল ও দুপুর। বিকেলের দিকেও উঠতে পারলেন না। ততক্ষণে তাদের পাড়া জ্বলছে। আর এমন দাপট যে বর্ষার ভেজা বাতাসও সে আগুনকে দমাতে পারল না। কিন্তু ধানখেতেই বা এভাবে লুকিয়ে থাকবে কতক্ষণ! একে প্যাচপ্যাচে জলকাদা তার ওপর দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। অন্ধকারে এভাবে আরও কিছুক্ষণ পড়ে থাকা মানেই সাপকোপের মুখে বেঘোরে প্রাণ দেওয়া। কিন্তু কী করবেন কিছুই মাথায় ঢুকছিল না হরপ্রসাদের। তবে হরপ্রসাদ ভাবতে না পারলেও পেরেছিল নিত্যপদ। চিরকালই নিরীহ মানুষ। কারও সাতে পাঁচেও থাকে না। নাম সংকীর্তন ও পারঘাটায় নিজের ছোটো একটা মুদি দোকানের ব্যবসা এই নিয়েই ছিল। কিন্তু বিপদ আসাতে সেই নিত্যপদই যে এমন সাহসী হয়ে উঠতে পারে ধারণাও ছিল না হরপ্রসাদের। নিজের বউ-ছেলে-মেয়েদের তো বটেই প্রভূত সাহস যুগিয়ে হরপ্রসাদের পরিবারকেও সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে এল কুড়িগ্রাম থেকে। তারপর বর্ডার পেরিয়ে শরণার্থীদের ঢলের সঙ্গেই সোজা এখানে। ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অবসান হয়েছে। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্ম নিয়েছে নতুন একটি রাষ্ট্র বাংলাদেশ। আর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে সেসব রাজাকার আর আলবদরের লোকজনও গা ঢাকা দিয়েছে।

হরপ্রসাদের মতো অসংখ্য শরণার্থী ঢুকে পড়েছিল সীমান্তের বেড়া ডিঙিয়ে। বাংলাদেশ হওয়ায় সেই তারাই আবার ফিরতে শুরু করল নিজেদের ভিটে মাটির দিকে। হরপ্রসাদরাও তখন আর বসে নেই। ছটফট করছেন ফি-

যাবার জন্য। যাচ্ছিলেনও তাই। কিন্তু নিত্যপদই একদিন এসে শোনাল সেই ভয়ংকর কথাটি। হরপ্রসাদকে জানাল, ফেরার আর উপায় নেই। আগুন আগেই লাগিয়ে দিয়েছিল তাদের ঘরবাড়িতে। এখন সেসব পোড়া ভিটেমাটি দখল করে নিয়েছে স্থানীয় মুসলমানরা। তবু হরপ্রসাদ চেষ্টাটা চালিয়েই যাচ্ছিলেন, কিন্তু সমস্যাটা তৈরি হল অন্য জায়গায়। পাকিস্তানি দুঃশাসন মেনে নিতে পারেনি পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা। তার ওপর ছিল ভাষার প্রশ্ন। বাংলাকে তুলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া থেকেই তাই বিক্ষোভের শুরু। ফলে ভাষা আন্দোলন থেকে বাড়তে বাড়তে শেষপর্যন্ত একসময় তা মুক্তিযুদ্ধেই দাঁড়িয়ে যায়।

দেশের স্বাধীনতা চেয়েছিল ওদেশের বিপুল সংখ্যক মুসলমান। পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসনের নাগপাশ থেকে তাই ছিন্ন হতে চেয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা ও ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে অবশেষে সম্মিলিত বাংলাদেশ-ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল পাকিস্তানী বাহিনী। জন্ম নিল বাংলাদেশ। বহু কাঙ্খিত স্বাধীন বাংলা ভাষার দেশ। স্বাধীনতার জয়োল্লাসে বেরিয়ে পড়ল তারা। কিন্তু অচিরেই তাদের কপালে আবার ভাঁজ পড়ল শরণার্থী হিন্দুরা ফিরে আসায়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে হানাদার বাহিনীর অত্যাচার ও খুন-জখম এবং ধর্ষণের ভয়ে হাজারে হাজারে হিন্দুরা সাতচল্লিশের দেশভাগের পরেকার মতো ফের বর্ডার পার হয়ে ইন্ডিয়ায় ঢুকেছিল। ঢুকলেও সাতচল্লিশ ও পঞ্চাশের শরণার্থীরা ফিরে যায়নি কিন্তু একাত্তরের শরণার্থীরা ফের ফিরে গিয়েছিল নতুন ও স্বাধীন দেশে। কিন্তু তারা ফিরলেও এটা মেনে নিতে চায়নি স্বাধীন দেশের একটা বড় অংশই। তারা ভেবেছিলেন যারা গেছে আগের মতোই তারা আর ফিরবে না। ফলে তাদের পরিত্যক্ত জমি-জায়গা, চাকরি-ব্যবসা সবই তাদের ভোগে আসবে। কিন্তু বাদ সাধল একাত্তরের শরণার্থীরা। তারা ফিরে এল এবং নিজের নিজের জায়গা-জমির অধিকার ফিরে পেতে চাইল। ফলে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠল ভেতরে ভেতরে। প্রচার শুরু হল, কেবল একাত্তরই নয় এই সুযোগে গত তেইশ বছরের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরাও ফিরে আসছে আবার। যারা গিয়েছিল সাতচল্লিশ-পঞ্চাশ-আটান্ন-বাষট্টি বা চৌষট্টিতে। ফিরে এসে দাবি করবে আবার তাদের পুরোনো অধিকার। ফলে স্বাধীন দেশেও বাংলা ভাষার নতুন একটি রাষ্ট্রেও শুরু হল আবার হিন্দু বিরোধিতা। একান্ত বাধ্য হয়েই তখন নতুন সরকারকে ঘোষণা করতে হল, কেবলমাত্র একাত্তরের শরণার্থীদেরই গ্রহণ করবে বাংলাদেশ এবং তাদের যথাযোগ্য পুনর্বাসনও দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে তা আর হয়ে উঠল না। ফলে ফিরে যেতে চাইলেও ফিরতে

পারলেন না আর হরপ্রসাদরা।

দেশ ভাগের সময় হরপ্রসাদ ছিলেন ছাত্র। নিতান্তই অল্প বয়স। কিন্তু হলেও বুঝেছিলেন, হাজারে হাজারে মানুষ দেশত্যাগী হলেও, তার বাপ-জেঠারা নিজের ভিটেমাটি ছাড়তে চাননি। চোখের ওপরে দাঙ্গা-খুন-খারাপি-লুটপাট ও মেয়েদের ইজ্জত লোটার ঘটনা দেখেও মাটি কামড়ে ধরে প্রতিরোধ করেছিলেন। কিন্তু কে ভেবেছিল এ প্রতিরোধ নিছকই বালির বাঁধ। ফলে একাত্তরের ঢেউয়ে সেই বাঁধটিই গেল জলের তোড়ে হারিয়ে। নিত্যপদকে ধরে তাই সীমান্ত-সংলগ্ন ভারতেই নতুন করে বাঁচার চেষ্টা শুরু হল। তাও তো দেখতে দেখতে কত বছর হয়ে গেল। অথচ এতদিন পর হঠাৎই আবার কী জিগির উঠল যে তারা পরদেশী। অনুপ্রবেশকারী। ঘুঁসবৈটিয়া।

রাস্তা পার হয়ে দাওয়ার কাছাকাছি এসে মাদুরটা রাখতে যাচ্ছিলেন হরপ্রসাদ, এই সময়েই চোখে পড়ল কুয়াশা। পাকিয়ে পাকিয়ে যেন ঘন হয়ে আসতে শুরু করেছে।

হরপ্রসাদ সেই কুয়াশার দিকে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

আট

দরজায় খুট করে একটা আওয়াজ উঠেছিল। উঠতেই দরজার পাল্লার পেছনে নিজেকে আড়াল করল রাশেদ। পরে পারুলকে আবিষ্কার করেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি আইয়া দুইবার ঘুইর‍্যা গেছি—

দুইবার! রাশেদ লজ্জা পায়।

হ। দেখি তুমি অঘোরে ঘুমাইতে আছো—

রাশেদ হাসে একটু বোকার মতো, হ ঘুমাইয়া পড়ছিলাম।

বলতে গিয়েই রাশেদ তক্তাপোশের একপাশ থেকে তার ব্যাগটা তুলে নেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠে, অহনো বাইরে আলো আছে। কুয়াশ নামে নাই। আমি অহন যাই তইলে—

কই যাইবা? নীচু স্বরেই জিজ্ঞেস করে পারুল।

যাওনের কথা তো বারসই। ওহানে গেলে কামও জুটব আর ধরা পড়নেরও ভয় নাই—

সেইটা কুনখানে জানি না। তয় অহনে বাইর অইতে পারবা না। বাইর হইলেই ধরা পইড়্যা যাইবা। দুপুরেও দেখলাম বিএসএফ ঘোরাঘুরি করতে আছে। হেগো সন্দেহ এই গায়ের কুনোখানেই লুকাইয়া আছো তুমি। জানি

না হেরা তোমারে দেখছে কিনা?

হ দেখছে তো—

দেখছে? পারুল চমকে ওঠে, কেমনে দেখল! কইলা যে বিডিআর ঢুকাইয়া দিছে—

হ দিছে তো। হেইয়ার পর—বলতে বলতে রাশেদ জানায় গত রাতের ঘটনাটা। বলে কীভাবে সে একটা বিশাল গাছের গুঁড়ি পেয়ে সেটা আঁকড়ে ধরে বেঁচে গেছে। নাহলে ধরাই পড়ে যেত। এই কথাটা সে বলতে শুরু করেছিল একবার। সকালেই কী ভেবে পারুলকে বলেছিল একটু। এবারে সবটা বলে একটু স্বস্তি পায় সে। স্বস্তি এ কারণে যে, অন্তত বোঝাতে পেরেছে, সে উটকো একটা লোক হলেও খারাপ নয়। কোনো বদ মতলবে সে ঢুকে পড়েনি।

পারুল শুনে অবাক। একটু সময় হাঁ হয়েই তাকিয়ে রইল। এরপর কী মনে পড়ায় আবার বলে উঠল, আইচ্ছ্যা—খাড়াও একটু—

বলতে বলতে উঠে পড়ল পারুল এবং মুহূর্তেই ফিরে এল হাতে একটা বাটি নিয়ে। তাতে রুটি আর আলু কুমড়োর তরকারি একটু।

লও এইটা খাইয়া লও। সকাল থিকা না খাইয়া আছো—

না না, রাশেদ বাধা দেয়, আমার খাওন লাগব না। আমার খুধা নাই—

নাই কইলে মানুম ক্যান! হারাদিন প্যাটে কিছু পড়ে নাই...

বাটিটা রেখে পারুল আবার পা বাড়ায়, আমি তোমার জল লইয়া আসি—

পা বাড়াচ্ছিল পারুল এমন সময় রাশেদ শুধোয়, আইচ্ছা তোমাগো বাড়িতে এত পুতুল বানায় কে! তুমি নিকি?

হ। পারুল লজ্জা পায়।

কী সোন্দর পুতুলগুলি? এ্যাতো সব পুতুল বানাও ক্যান—! বেচো নিকি?

হ। বেচি তো। কত লোক আইয়া কিনন্যা লইয়া যায়—

বাড়িতে আহে না তুমি কান্ধে কইর‍্যা ফিরি কর? রাশেদ শুধোয়।

পারুল মাথা নাড়ে। নেড়ে জানায় তাদের দোকানের কথাটি। আগে শ্বশুর চালাত। কিন্তু চোখ যাবার পর থেকে সে দোকান পারুল নিজেই চালায়।

কিন্তু তার সোয়ামি! সে গেল কোথায়? রাশেদ ভাবে। পারুল যেন সকালে বলতে বলতেই থেমে গেল। তার প্রসঙ্গে গিয়েও যেন বলল না আর কিছু। এখনও আবার বলতে বলতেই থমকে যাচ্ছে। রাশেদ একবার কথাটা তুলল কিন্তু তুলতে গিয়েই পারুলকে নীরব হতে দেখে পরে বলেও ফেলল, থাক ইচ্ছা না হইলে কইও না—

না না, কমু না ক্যান! না কওনের আর অসুবিধা কী? পারুল জানায়। জানিয়ে বলে সব কথা। তার বাড়ির কথা। তার বাবা- মা-ভাই-বোন-এর কথা। তার বিয়ের কথা। এবং যার সঙ্গে বিয়ে হল সেই মানুষটির কথা।

শুনে রাশেদের গলায় আক্ষেপ, হায় হায় এইয়া কও কী! কিন্তু কই গেল জানতে পারলা না, না?

পারুল চুপ। কানে তো এসেছিল বিডিআরের গুলিতেই মারা গেছে সে। কিন্তু বডি না পাওয়ায় আবার বিশ্বাসও হয়নি। ওদিকে ফিরে না আসায় সন্দেহও যেন দানা বেঁধে উঠেছিল। তবু কোথাও একটা আশা উঁকি দিয়েছিল। উঁকি দিয়েছে বাইকটা খুঁজে না পাওয়ায়। তাছাড়া শুনেছিল যেন, বিডিআরের গুলিতে মরা ওই বডি সেদিনের কোনো পুরুষের ছিল না। তবে মানুষটা গেল কোথায়? ভেবে ভেবেও কোনো উত্তর পায়নি পারুল। তবু আশায় বাঁচে চাষা। পারুল সেই আশায়ই বেঁচে রইল আর বাঁচিয়ে রাখল শ্বশুর নিত্যপদকে।

চুপচাপই ছিল একসময় পারুলই বলে উঠল, তয় দ্যাখতে কিন্তু তারে এক্কারে তোমার লাখান। আমি তো পরথম দেইখ্যা চমকাইয়া উঠছিলাম। বুক কাইপ্যা উঠছিল আমার—

তাই নিকি! রাশেদ তাকায় ফ্যালফ্যাল করে। তার চোখের কোণে ভয়ের আভাস।

পারুল জানায়, হ। এক্কারে হেই নাক হেই চক্ষু হেই রকমই লম্বা চওড়া। তয় তোমার লাগান এমুন কালা না—

বলতে গিয়েই পারুল ভাবে আর সেই দুর্বলতার কারণেই তো মানুষটাকে ধরিয়ে দিতে পারেনি সে। নাহলে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখটা চেপে ধরেছিল আচমকা।

চুপ করেই ছিল একটু সময়। এই সময় রাশেদই আবার বলে ওঠে।

শুকনো গলায়ই রাশেদ জানায়, নদী পাড়ের মানুষ ধলা হমু ক্যামনে? আইচ্ছা একখান কথা জিগামু? চাপা স্বরেই এদিকে ওদিকে তাকায় রাশেদ।

হ জিগাইবা না ক্যান! পারুল এখন অনেকটাই স্বচ্ছল। প্রথম দর্শনের অচেনা মানুষটিকে দেখে যে ভয়টা ছিল সেটা যেন উধাও হয়েছে কখন। নারীর চোখ, পুরুষের মনের অতলে ঢুকতে বুঝি সময়ও নেয় না তেমন।

রাশেদ শুধায়, তোমার মুখে হুনতে আছি আমগো দ্যাশের ভাষা। তুমি এই ভাষা শিখল্যা কী কইর‍্যা?

ক্যান আমগো দ্যাশ আছিল না হেইপাড়ে—

আছিল! রাশেদ প্রায় চেঁচিয়েই উঠতে যাচ্ছিল আচমকাই পারুল ওকে

থামিয়ে দিল, আস্তে.... আস্তে কও। কে কইথিকা হুইন্যা ফালায়...

রাশেদ ভয়ে চুপসে যায়। যে উচ্ছ্বাসে ও লাফিয়ে উঠেছিল তেমনি ভয়েই আবার ভাবাবেগটির টুঁটি টিপে ধরে সে মুহূর্তেই। ধরে চুপ করে সে গুটিয়ে থাকে।

ওই তখনই পারুল জানায়, আমগো দ্যাশ আছিল কুমিল্লা। কিন্তু আমি দেহি নাই। আমার অবিশ্যি দেহনের কথাও নয়। তাই কুমিল্লার ভাষা অবিকল কইতে পারি না। তয় মিলাইয়া-মিশাইয়া কই—

কিন্তু দ্যাশ আছিল অথচ ছাইড়্যা আইল্যা। আমার লাখান কী ভিখারি নিকি তুমরা! তোমাগো এমনু অবস্থা ক্যান?

কী আর করব, পঞ্চাশের দাঙ্গায় সর্বশান্ত হইয়া গেল আমার বাপ-ঠাকুর্দারা। ভিটা পুড়ল ঘরবাড়ি জ্বলল। গ্রামে-গঞ্জে তখন লুটপাট খুন জখম আর আগুন। আগুন লাগানো হইতে আছে ধইর‍্যা ধইর‍্যা আমগো পাড়াগুলিতে। হ্যাযে থাকতে না পাইর‍্যা পলাইয়া আহে আমার বাপ-ঠাকুর্দারা। আমার বাপেরই বয়স তখন ছয়। কিন্তু....

বাবার কাছে শোনা এবং বাবারই স্মৃতিটা যেন এই এতক্ষণে আবার পারুলের মন থেকে উঠে এসেছে। ঠিক যেন সে-রাতেরই মতো।

সেই রাতে গোটা পরিবার পালাচ্ছে তখন লুকিয়ে চুরিয়ে। পেছনে তাদের জ্বলন্ত সংসার। ঘরবাড়ি ভিটে-মাটি আর সম্পদ। পালাতে পালাতে ভয়ে ও আতঙ্কে জনা পনেরর পরিবারটি কোনো ক্রমে একটা ট্রেন পেয়ে যেন হাঁফ ফেলে বেঁচেছিল। কিন্তু কে জানত বিপদ তখনও কাটেনি পুরোপুরি। বরং সামনে আরও ভয়ংকর মৃত্যুফাঁদ নিয়ে যেন ওত পেতেছিল।

ট্রেন চলছিল আস্তে আস্তে। ভেতরে প্রতিটি কামরায় যেন আতঙ্ক ও শিহরণের ছায়া। তাই কোনো শব্দ নেই। ভাষা নেই। এমন কী কোলের বাচ্চাটাও যেন নীরব। ভোরের দিকে ট্রেন ঢুকল ময়মনসিংহে। ঢুকেই যেন আস্তে আস্তে ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুনেছে বাবার কাছে, ইঞ্জিনের ড্রাইভারই ইচ্ছে করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল গাড়িটাকে। আর দিতেই দুধার থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ। দল বেঁধে রাজাকারেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। যারা পাড়ল ঝাঁপ দিল নীচের নদীতে। কিন্তু দিয়েও কি রেহাই আছে? রেহাই নেই। ইট মেরে মেরে তাদের মাথা ফাটানো হতে লাগল। আর বাকি যারা ট্রেনের কামরায়, নির্বিচারে চলল হত্যা। বেছে বেছে নারীদের করা হল ধর্ষণ। দুই পিসি ছিল পারুলের। ট্রেনে দুজনেরই ইজ্জত লুট করে তাদের কেটে ফেলা হল। কেটে ট্রেনের দরজাটা দিয়ে কাটা টুকরোগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল

বাইরে। ছ'বছরের ছেলে রাজেন ছিল মায়ের পাশে। মুহূর্তেই মাকে টেনে নিয়েই সবার অলক্ষ্যে ঢুকে পড়ল সে সীটের তলায়। এভাবে যে কতক্ষণ কাটল, একসময় মেরে কেটে ইজ্জত লুটে দাঙ্গাবাজরা সরে পড়তেই সে মাকে নিয়ে বেরিয়ে এল। ট্রেন ততক্ষণে আবার চলতে শুরু করেছে। আর একটু গিয়ে একটা স্টেশনে দাঁড়াতেই সে মাকে নিয়ে লাফিয়ে নামল। কামরার ভেতরে তখন মৃতের গাদা। এবং জেঠা নেই, জেঠি নেই, বাবা নেই, পিসিমারা নেই। নেই তার ভাই-বোনেরাও। তারা যে কোথায় রইল কোথায় মরল কিছুই টের পেল না সে। কেবল অন্ধের মতোই মাকে নিয়ে ছুটেছে তখন রাজেন। আর এভাবে ছুটতে ছুটতে যে কীভাবে এখানে এসেছে আর কীভাবে যে এখানে এসে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সে এক দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস। সে ইতিহাসের কোনো কোনো জায়গা স্পষ্ট হলেও অনেক জায়গাই আবার অধরা রয়ে গেছে পারুলের কাছে। তবুও কখনো-কখনো কেন যে পারুলের মনে পড়ে যায় সেসব।

বউ—ও বউমা—

সামনের ঘরের ওই বুড়ো। রাশেদেরই কানে এসেছিল প্রথম। আবারও ডাকতেই এবার পারুল উঠল, যাই একবার দেইখ্যা আহি গিয়া। তুমি এইটা খাইয়া লও। আমি আহনের সময় জল লইয়া আসুম—

কিন্তু আমার যে একবার বাইর অইতে হইব—

বাইরে যাইবা?

হ সকাল থিকা এমুন কইর‍্যা বইয়্যা আছি... অহনে যে একবার—

পারুল বোঝে প্রাকৃতিক কাজেই একবার বাইরে বেরোতে চাইছে লোকটি। পারুল কী ভাবে। একবার এপাশে ওপাশে কান খাড়া করে কী শোনে। এরপর জানায়, পাশেই পাক ঘর। পাক ঘরের পিছনে একখান ছোটো দরজা আছে। দরজার বাইরেই পুকুর। ওই পুকুরের পাড়ে বাঁশবনে গিয়া....তয় সাবধান, কেউ য্যান দেইখ্যা না ফালায়। অবিশ্যি ওই দিকে কেউ যায় না—

না গেলেও আমি দেইখ্যা হুইনা যামু অহন—। রাশেদ জানায়। আর জানাতে গিয়েই বাইরের ঘর থেকে আবারও সেই গলা। পারুলকে ডেকে যেন একটু কাশলও সময় নিয়ে। পারুল উঠল, না যাই....দেইখ্যা আহি একবার—

পারুল উঠে চলে গিয়েছিল। আর পারুল উঠতেই দরজা দিয়ে উঁকি মারল একবার রাশেদ। এই দিকে কুনহানে পাকঘর কইল য্যান। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে নিঃশব্দেই বেরিয়ে এল রাশেদ। পা টিপে টিপে এরপর বাঁদিকে সরে

গেল। এপাশেওপাশে চোখ রাখতেই এরপর চোখে পড়ল পাক ঘরটি। রাশেদ নিঃশব্দে সেঁধিয়ে গেল। এরপর পাকঘরের ছোটো দরজাটি খুলে খুব সন্তর্পণে বাইরে।

ওপাশে বাঁশবাগান। এপারে পুকুর একটা। পুকুরের পাড়ে গোটা দুই কাঁঠাল গাছ। দু-তিনটে নারকেল। জলের ওপরে প্রায় ঝুঁকে পড়েছে।

বাঁশবাগানে উঠতে গিয়েও একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখল সে। যদিও আলো এখনও আছে বাইরে কিন্তু একে বাঁশবাগানের অন্ধকার অন্যদিকে একটু একটু করে উড়ে আসা কুয়াশা। রাশেদ টের পেল, আর বেশিক্ষণ নেই। উড়তে উড়তে এবার কুয়াশা দখল নেবে পৃথিবীর। পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে বাঁশবাগানের ভেতরে ঢুকে পড়ে রাশেদ। আর ঢুকতেই পায়ের শব্দ। রাশেদ চমকে তাকায়।

দুটো কুকুর। ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে একবার রাশেদকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল। বুঝেছে সে এদিককার কেউ নয়। রাশেদ বুঝল একটু দুর্বল হলেই এবার বিকট স্বরে চেল্লাতে শুরু করবে। ঢাকঢোল পিটিয়ে জানাবে সবাইকে এদিকে একটা অচেনা লোক ঢুকে পড়েছে। আর জানালেই বিপদ। ঠিক ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু রাস্তার ছেলে রাশেদ। ছেলেবেলা থেকেই কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে রাস্তায় শুয়ে মানুষ। কাজেই কুকুরের স্বভাব তার জানাই আছে। রাশেদ তাই মুখ থেকে একটা শব্দ তোলে। ভুগভুগ। কুকুর দুটো তাকায়। তাকাতেই রাশেদের মুখে আবারও শব্দ। এবার কুকুর দুটো পরস্পর পরস্পরের দিকে চোখ রাখে। রেখে কী বোঝে। এরপর আবার কুয়াশায় ভেজা শুকনো পাতার ওপর দিয়েই এগিয়ে যায়।

এগিয়ে বাঁশবাগান থেকে বেরিয়ে খানিকটা ঘুরে ফিরে যখন আবার পুকুরের ধারে এসেছে, ওই সময়েই পুকুরের জল থেকে হাতমুখ ধুয়ে খানকতক ডুব মেরে উঠেছে রাশেদ। ঘর থেকে বেরোবার পর থলেটা বগলে চেপেই নিয়ে এসেছিল সে। পরে বাঁশবাগানের এক ধারে পুকুরের পাড়ে রেখেই আস্তে আস্তে নেমেছিল জলে। এবং শব্দ না করে খানকয়েক ডুব মেরে উঠেই গামছা দিয়ে গা-মাথা মুছেই আবার ঢলঢলে প্যান্টটা পরে নিয়েছে পা গলিয়ে। পরে কোঁকড়ানো জামাটা। তার ওপরে একটা উলের হাফ গেঞ্জি।

গেঞ্জিটা কিনেছিল সে ইন্ডিয়া থেকেই। গত শীতে। কিন্তু খুব একটা পরা হয়নি। পরবে কী ঠান্ডা-টান্ডা খুব তীব্র হলে এক কথা, নাহলে শীতবস্ত্র খুব একটা গায়ে তোলে না রাশেদ। তুলতে হয় না। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সারা বছরই তাই পরনে ঢলঢলে প্যান্ট আর ওই একটা কোঁকড়ানো ফতুয়া জামা।

জামা-টামা পরে এগোবে রাশেদ, এগোতে গিয়েও একবার পুকুরটার দিকে তাকাল। চারদিকে নারকেল কাঁঠাল আর জারুলের মাঝে বনতুলসী আর লতানে ঝোপের জঙ্গল। জায়গাটা তাই এমন নির্জন। নির্জনতা আরও ওদিকে ওই বাঁশবাগানের জঙ্গলে। ভেসে আসা মলমূত্রের গন্ধের পাশাপাশি কুয়াশার একটা ঘ্রাণও নাকে এল রাশেদের। পুকুরের জলের ওপরে যেন চাপ বেধে নেমে এসেছে কুয়াশাটা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তাঘাট ও গ্রাম জনপদ সবই দখল করে নেবে।

রাশেদ দাঁড়িয়ে পড়ে। এই বেলা কি তাহলে বেরিয়ে পড়বে সে! বেরিয়ে কুয়াশায় গা ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে এই গ্রামটা ছেড়ে বেরোতে পারলেই হল। তবেই আর ওই বিএসএফ খুঁজে পাবে না তাকে। আর সে-ও জিজ্ঞেস করে-টরে ঠিক বারসইয়ের রাস্তা খুঁজে নিতে পারবে।

ভাবতেই পা বাড়াচ্ছিল রাশেদ। বাড়াতে গিয়েই আবার থমকে দাঁড়ায়। মনের মধ্যে ততক্ষণে ভেসে উঠেছে ওই মেয়ের মুখ। মেয়ে না বউ। কী যেন নাম? কী একটা নামে যেন সকালে কে এসে ডাকছিল তাকে। কিন্তু মেয়েটা ওর জন্য যা করেছে তাতে ওকে না-বলে যাওয়াটা অন্যায়। ইচ্ছে করলে তো সে তাকে ধরিয়ে দিতে পারত। কিন্তু ধরিয়ে দেয়নি। লুকিয়ে রেখেছে। এমন কী তাকে সাময়িক আশ্রয় দিতেও পিছিয়ে যায়নি। প্রথমে ভয় পেয়েছিল ভীষণ। পরে ওর দিকে তাকিয়ে অবাকই হয়েছিল। চমকেও উঠেছিল যেন। রাশেদ বুঝতে পারেনি। পরেই জানতে পেরেছে রহস্যটা। বউটার সোয়ামিকে দেখতে নাকি ঠিক ওরই মতো। আস্তে আস্তে বউটার ভয় ভেঙে গেছে এতে।

কিন্তু সে কেন আর থাকবে! সে তো এখানে থাকতে আসেনি। তাছাড়া থাকলেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা। আর ধরা পড়লে ওদেরও বিপদ। রাশেদকে লুকিয়ে রাখার অপরাধে ওদেরও ওপর তান্ডব চালাবে ওই বিএসএফ। তারচেয়ে একবার বেরিয়েছে যখন চলে যাওয়াই ভালো।

বাঁশবাগানের ভেতরে ঢুকে এপাশে ওপাশে তাকাচ্ছিল এমনই সময় যেন কার গলার শব্দ। কোনও মেয়ে যেন কাকে ডাকছে চেঁচিয়ে। ত্বরিতে বাঁশবাগান থেকে নেমে এসেই আবার পা চালিয়ে ফিরে এল রাশেদ। ফিরেই সেই দরজার ভেতরে।

নয়

সীমান্ত লাগোয়া এই শহরটি বড় চুপচাপ। শহর সে অর্থে নয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার শেষ সীমানার একটা নড়বড়ে অংশ। এই অংশই হল গিয়ে হিলি। মাঝে একটা রেললাইন। পার্বতীপুর জংশন হয়ে ট্রেন আসছে। রেল লাইনের একদিকে ভারতের ইমিগ্রেশান অফিস। শুল্ক বিভাগের চেক পোস্ট। টাকা বদলানোর জায়গা। অন্যদিকে লাইন টপকালেই বাংলাদেশের অভিবাসন দপ্তর। ওই জায়গাটা বাংলা-হিলি। বাজারহাট দোকানপাট অফিস আর ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক পার হলেই দুধারে ধানের খেত। পাটের খেত। আর হাতির কানের মতো লখজগে তামাকের পাতা। কাঁচা এবং কালচে সবুজ। দিগন্তব্যাপী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রোদ শুষে নিচ্ছে। নিতে নিতে এই চাষই আরও গভীর হয়েছে হাকিমপুর থানা পেরিয়ে একবারে সেই রংপুর বাজার পর্যন্ত। উন্নতমানের সিগারেট ও চুরুট তৈরির জন্য এ অঞ্চলের উৎপাদিত তামাক একসময় প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা হত। কিন্তু বর্তমানে তামাক কিংবা ধূমপানের অপকারিতা বিষয়ে 'সংবিধিবদ্ধ নীতিমালার' কারণেই এই চাষের উৎসাহে বেশ ভাটা পড়েছে। তবুও রাস্তার দুপাশ থেকে এদিকে-ওদিকে এখনও যথেষ্ট এই চাষ। ফাঁকে ফাঁকে এরই মাঝে ধান আর সবজি। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে কখনও বা ধাক্কা খেয়েছে রেললাইনের গায়ে কখনও বা আবার থমকে দাঁড়িয়েছে কাঁটাতারেরই বেড়ার সামনে। ওই ওখানেই বর্ডার। লোহার শক্ত খুঁটি পুঁতে পুঁতে তারই গায়ে জড়ানো হয়েছে তীক্ষ্ণ কাঁটাযুক্ত পাকানো লোহার তারের দড়ি। ওই দড়িই দুই দেশের সীমানা চিহ্ন।

আগে এমন ছিল না। সাতচল্লিশে দেশভাগের আগে পর্যন্ত এসব জায়গা ছিল অবিভক্ত ভারতেরই অংশ। কিন্তু দেশভাগ হয়ে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হতেই প্রশ্ন উঠল সীমানার। নতুন রাষ্ট্রের সীমানা কী হবে! অগত্যা সীমান্ত কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস উভয়ের কাছেই সীমানা বিন্যাসের জন্য পরামর্শ আহ্বান করেন। সেই হিসেব মতো দু তরফেই স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে দাবি ছিল দু তরফেরই দুরকম। কেননা জিন্নার ঘোষণা ছিল, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল, বালুচিস্তান, বাংলা ও আসাম নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হবে। লীগের তরফে কলকাতা জেলাকেও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়। কিন্তু সাতচল্লিশের চোদ্দোই আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম এবং পনেরোই আগস্ট দেশভাগের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এলেও সীমানা তখনও

ঠিক করা যায়নি। তিন চারদিন পর আঠেরোই আগস্ট বাউন্ডারি কমিশন তার সুপারিশ প্রকাশ করে। সুপারিশ অনুযায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হল। সমস্ত চট্টগ্রাম ও ঢাকা ডিভিশন, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও রাজশাহীর পাবনা জেলা এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগের খুলনা জেলা নিয়ে গঠিত হল পূর্ব-পাকিস্তান। যা পূর্ব-বাংলা। আর অন্যদিকে বাংলারই আর এক অংশ সমস্ত বর্ধমান বিভাগ, কলকাতা ও কলকাতা জেলা, চব্বিশ-পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও দার্জিলিং পশ্চিমবাংলার মধ্যে ঢুকে ভারতসীমানা ভুক্ত হয়। এছাড়া নদীয়া, যশোর, দিনাজপুর, মালদা ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচটি জেলাকে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়। ফলে সীমানা রক্ষিত হয় কাঁটাতারে। আর এই সীমানা লঙ্ঘনের অধিকার দুই বাংলার মানুষের নিজেদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপরে আর নির্ভর করল না। তৈরি হল পাসপোর্ট ভিসা ও অন্যান্য সব নিয়মকানুন। এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলেই শাস্তি। বসে গেল তাই নিয়মের প্রহরীরা। আর এ নিয়ম প্রযোজ্য হল কেবল মানুষেরই ক্ষেত্রে। কিন্তু পাখিরা! পাখিদের ক্ষেত্রে সবই ছাড়। তাই পাখি পাল্টাচ্ছে আকাশ, পাখি পাল্টাচ্ছে ভূমি। পায়ে পায়ে খুদকণার সন্ধানে এই পার হল লাইন, লাইন পার হয়ে ভূমি, আবার অন্যদিকে লাফিয়ে এসে দাঁড়াল কাঁটাতারেরই কাছে। গলে গেল কাঁটাতারের ফাঁকে। আবার ফিরেও এল যেন সেভাবে।

তাকিয়ে তাকিয়ে জানলার ফুটোয় চোখ রেখে বাইরে কী দেখছিল রাশেদ। ইতিমধ্যে রোদ উঠেছে কুয়াশাও সরে গেছে অনেক। বাইরেটা তাই এখন অনেক পরিষ্কার। স্কুলে সেই গাছটা দেখা যাচ্ছে আর তার ঝাঁকড়া মাথায় কত পাখি। কী আনন্দেই না ডাকছে। উড়ছে। সীমানা পাল্টাচ্ছে আবার বদলে নিয়ে ভিন্ন সীমানায়ও ঢুকে পড়ে সুর তুলছে।

দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে পড়েছিল রাশেদ। হঠাৎই কী একটা শব্দে সে চমকে উঠল। চমকে চট করে পেছনে ফিরেই আবার আশ্বস্ত হল। একটা ইঁদুর। তক্তাপোশের তলা থেকে বেরিয়ে লাফাতে গিয়েই একটা হাড়ির ঢাকনা ফেলেছে। ফেলেই তার ওপর দিয়ে ছুটল। রাশেদ হাসল আপন মনেই।

কাল সীমান্তে খুব গুলিবর্ষণ চলেছে। রাতে শুয়েই কানে এসেছে রাশেদের। এদিকে একটা শব্দ উঠেছে তো ওদিক থেকে আবার ফিরে এসেছে শব্দটা। অর্থাৎ বিএসএফ ও বিডিআরের সীমানা রক্ষার লড়াই। কিন্তু মরে গেল কি কেউ! গুলি কারো গায়ে লাগল কি?

জানার জন্য ছটফট করছিল রাশেদ। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই বার কয়েক

তাই ওই জানলার ফুটোয় চোখ রেখেছিল। কিন্তু রাখলে কী হয়, ঘন কুয়াশা বাইরে। তাই কিছুই বোঝা যায়নি। ফলে ছটফট করছিল সেই থেকে কখন কুয়াশা কাটে আর মাঝেমধ্যেই দরজার দিকে তাকাচ্ছিল যদি পারুল ঢোকে। ঢুকলে ওর কাছ থেকেই খবরটা নেবে সে। নিয়েই বেরোবে। এইসব ভেবেই অস্থির হয়ে পড়ছিল, এমনই সময় পারুল ঘরে ঢুকে বলল,

খুব গোলমাল হইছে কিন্তু কাইল বর্ডারে—

হ। গুলির শব্দ কানে আইছে রাইতের দিকে। কী অইছে কও তো! গুলি ক্যান চলল?

তা কেমনে কমু? তয় থমথামাইয়া আছে বর্ডারখান—

তইলে! অহনে কী অইব? একরকম হতাশ হয়েই উত্তরটা দিয়েছিল তখন রাশেদ।

পারুল তাকিয়েছিল এপাশেওপাশে। বলল, কীসের কী অইব?

বাহ্ কথা হোনো বউ ঠাড়াইনের! রাশেদের চোখ গিয়েছিল জানালার সেই ছিদ্রের দিকে। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে বলল, আমারে যে যাইতেই অইব আইজ।

পারুল চুপ। প্রথমে কোনো কথা বলে না। পরে রাশেদ আবারও কী বলে ওঠার চেষ্টা করতেই জানায়, তইলে যাও। কেউ তো তোমারে আটকাইয়া রাখে নাই। ঢুইক্যা যখন পড়ছ বাইর অইবা তো নিশ্চয়ই। তয় আমারে বিপদে ফালাইও না! কাইল রাতে গুলি চলনের পর এই দিকে অহনে ভীষণ উত্তেজনা। সকাল থিকাই টহল দিতে আছে বিএসএফ—

তইলে? রাশেদ যেন ভেঙেই পড়ে, যামু কেমনে?

কেমনে যাইবা তার আমি কী জানি! পারুলের চোখে মুখে বিরক্তি। ঝাঁঝিয়েও ওঠে যেন খানিকটা। রাশেদের নজর এড়ায় না তা। সামান্য পরে একটু ভয়ে ভয়েই বলে, তুমি য্যান কেমন কইর‍্যা কও। বিপদে পইড়্যাই তো ঢুকছি। বর্তন হাতানের লাইগ্যা তো ঢুকি নাই—

রাশেদের স্বর যেন নরম। বহু দূর থেকেই যেন ভেসে আসে। পরে উঠে দাঁড়িয়েই সে তার থলেটা হাতে তুলে নেয়। কিন্তু নিতে না নিতেই পারুল একটু যেন সামনে এগিয়েই বাধা দিল, থাউক অনেক হইছে। অহনে আর বাইর হইয়া কাম নাই—

রাশেদ থমকে দাঁড়াল। কিছু বলে ওঠার আগেই আবারও পারুলের গলা ওঠে, জলে নি পড়ছ যে অহনি যাইতে অইব। একটু অপেক্ষা কইর‍্যা গেলে কী হয়—

রাশেদ যেন চমকেই ওঠে। পথে-প্রান্তরের মানুষ সে। মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছে। আবার কামলাঘাটায় কাজের জন্য গিয়ে বসেও থেকেছে। সংসার কী সে তা জানে না। সংসারের প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার বিন্দু-বিসর্গও সে অনুভব করে না। সেই কবে নানির কোলের স্নেহে ও মমতায় লালিত হয়েছিল কদিন। সেই স্মৃতিটুকুই কেবল ভেসে আছে মনের গভীরে। তাবাদে আর অন্যকিছুর স্বাদ পায়নি সে কোনোদিন। যা পেয়েছে তা একরকম অবহেলা আর ঘৃণা। ঘৃণার বেশির ভাগটাই জুটেছে তার রাষ্ট্রের কাছ থেকে। রাষ্ট্র তাকে গ্রহণ করেনি। চেষ্টা সে করেছিল নানাভাবে। একটা কার্ডের জন্য কত লোকের কাছেই না গিয়েছিল। ভি-জি-এফ কার্ড। কার্ডের জন্য দরবারও করেছিল। বুঝিয়েছিল তার জন্ম এখানেই। এই দেশে। এখন একটা ভি জি এফ কার্ড হলেই সে থাকতে পারে এখানে। কিন্তু কার্ড হবে কী সে তার গ্রামের নাম বলতে পারে না। পাড়া-পড়শি দু' চারজনের কথাও সে জানাতে পারে না এমন কী তার মুক্তিযোদ্ধা বাপের পরিচয়ও ঠিকঠাক দিতে পারেনি। তবু কী, সে তো আর জানে না তার বাপ কত নম্বর সেক্টরে ছিল। কত নম্বর রেজিমেন্ট বা কোন বেস-ক্যাম্প! কিংবা তার সেক্টর কমান্ডারই বা কে? ফলে রাষ্ট্র তাকে বিশ্বাস করেনি। প্রবঞ্চক ভেবেই তাড়িয়ে দিয়েছে। তবুও হয়তো হয়ে যেত। কিন্তু বিনিময়ে অর্থ চাই। তা সে অর্থ কোথায় পাবে সে? তবুও একটু একটু করে কামাইয়ের টাকা থেকে কিছু কিছু করে জমাচ্ছিল রাশেদ। ভেবেছিল জমিয়ে জমিয়ে জমানো সে টাকা থেকেই রাষ্ট্রের অধিকার পাবে সে। তাই জমাচ্ছিল। কিন্তু....

পারুলের গলার স্বর এবারে যেন অনেক নরম, থইল্যা রাইখ্যা দাও—

হাতে একটা বাটি ছিল। হাত থেকে সেটা নামিয়েই একসময় জানিয়েছিল এরপর, রুটি রাইখ্যা গেলাম খাইয়া নিও। আর অই লাল কুঁজায় জল আছে খাওনের। আমি অহনে যাই। আমারে একবার দোকানে যাইতে হইব—

বলতে বলতে বাটিটা রেখেই চলে গিয়েছিল পারুল। আর সেই যে গিয়েছিল তারপর আরও অনেকটা সময় কেটে গেছে। এ সময়টায় সে জানলার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানালার ফুটো দিয়েই বাইরেটা লক্ষ করেছিল। আর কতক্ষণ যে এভাবে তাকিয়েছিল খেয়াল নেই। খেয়াল হল ইঁদুর একটা লাফিয়ে চলে যেতেই।

রাশেদ সরে এল। আর সরতেই ততক্ষণে আবার কী নজরে পড়েছে ওর।

কুয়াশা সরে যাওয়ায় ছোট্ট খুপরিটায় আলো ঢুকেছিল একটু। রাশেদের চোখে পড়ল তক্তাপোশের নীচে একটা বস্তায় জড়ানো কিছু মাটি। তারই পাশে

অর্ধসমাপ্ত একটি পুতুল। কৌতূহল হওয়ায় রাশেদ বসে পড়ল নীচে।

পুতুলটা শুকিয়ে শক্ত হয়ে এসেছে। রাশেদ হাতে তুলে দেখল এক বুড়ি। বয়স জনিত কারণে ঝুঁকে পড়ে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে। কিন্তু লাঠিটা হাতে নেই। আর বুড়ির থমকে দাঁড়ানোটাও বেশ কৃত্রিম। সম্ভবত এসব কারণেই পারুলের পছন্দ হয়নি। তাই ফেলে রেখেছে। শেষ আর করেনি।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল পুতুলটা। আর দেখতে দেখতেই কী যে হয়ে গেল। মনের ভেতরটা যেন আস্তে আস্তে পাল্টে যেতে থাকল রাশেদের। আর পাল্টাতেই মন হুহু করে উড়ল আকাশে। এবং উড়তেই দেখল সে যেন বসে আছে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে। ওদিকে ইসলামপুর। আরও ওদিকে মেলানদহ। ঘুরতে ঘুরতে এই এদিকেই এসে পড়েছিল সে ট্রেনে চেপে। এক সকালে কাজ খুঁজতে খুঁজতেই এরপর এসে দাঁড়াল কী এক গ্রামের ভেতরে। পাশেই ব্রহ্মপুত্র। মাঝে মাঝে শাদা বালির চর। ওই চরার ভেতরেই জলস্রোত। একটা দুটো খেয়া আছে সেই জলস্রোতটি পার করার জন্য। হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়িয়েছিল জলস্রোতের পাশে। পরে একটু এগোতেই চোখে পড়েছিল মাটির চাক। টাল দিয়ে রাখা হয়েছে এক জায়গায়। কাছেই দু তিন ঘর কুমোর। মাটির হাড়ি-কলসি তৈরি করছে। চোখে পড়ায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল রাশেদ। এই সময়েই নজরে পড়েছিল একটি বউ। কাছেই এক গাছতলায় বসে মাটি দিয়ে পুতুল তৈরি করছে। চুপচাপ হাঁ হয়ে বসে পড়েছিল রাশেদ। ভালোই লাগছিল পুতুল বানানো দেখতে। আর দেখতে দেখতে কোনোদিকে আর খেয়াল ছিল না। কিন্তু খেয়াল করল পালেদেরই এক বুড়ো। এগিয়ে এসে শুধিয়েছিল সে কে, কোথায় থাকে, এদিকে কেন এসেছে। রাশেদ জানিয়েছিল কাজের কথা। কাজের খোঁজে সে বেরিয়েছে। বুড়োর কী মনে হওয়ায় সে তাকে ডেকে দিয়েছিল কাজ। কাজ বলতে মাটি কাটবে মাটি ছানবে। বিনিময়ে দু বেলা পেট পুরে ভাত। এর বেশি আর অন্য কিছু দিতে পারবে না সে। কিন্তু রাশেদ তাতেই রাজি। থাকত খেত ও কাজ করত। আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ করত রোজ, বউটির পুতুল বানানো। লক্ষ করতে করতে ওর নিজেরই ইচ্ছে হত পুতুল গড়তে। এক সকালে মাটি ছানতে ছানতেই সে একদলা মাটি তুলে নিয়ে বানাতে শুরু করেছিল। এরপর মাঝে মধ্যেই সে বানাত। কিন্তু বানিয়েই ভেঙে ফেলত পাছে কেউ দেখে ফেলে। এভাবে কত যে পুতুল বানিয়েছিল। আজ এতদিন বাদে সেই মাটি দেখেই যেন আঙুলগুলো নিশপিশ করে উঠল রাশেদের। বসে পড়েই রাশেদ বস্তায় জড়ানো মাটিতে হাত দিল।

ছানা মাটি। এবং নরম। তাছাড়া মাটিতে কুঁচো পাটের আঁশও মেশানো

হয়েছে। একটু ভেঙে তা থেকে খানিকটা নিয়ে হাতের তালুতে তুলতেই বুঝেছিল মাটি নরম হলেও তাতে পানি দরকার। ঘরের একদিকে পারুলের দেখানো সেই লাল কুঁজোটা ছিল। পারুল বলেছিল ওতে পানি আছে। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে তক্তপোশের তলায় একটা কাদামাখা ভাঙা মগ আবিষ্কার করেই সেটা নিয়ে এল। এরপর কুঁজো থেকে একটু জল ঢেলে নিল তাতে। এরপর মাটিটা নরম করেই তাতে হাত লাগাল।

কিন্তু কী বানাবে? ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে হঠাৎই পারুলের অসমাপ্ত পুতুলটির দিকে তাকাতেই তার মাথায় কী খেলে গেল। মুহূর্তেই মাটি নিয়ে সে মাটিকে আঙুলের মাথায় ভেঙেচুরে একটি মূর্তি তৈরি করতে লেগে গেল। আর মূর্তি গড়ার কাজটি যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ঠিক তখুনি রাশেদ আবিষ্কার করল তার হাতের মুঠোয় নানি দাঁড়িয়ে। কিন্তু নানির চোখ যেন ঠিক নানির হল না, তাবাদে চুল তাবাদে ভাঙাচোরা ওই মুখটি। শুধু কি মুখ, নানির বুকের চুপসে যাওয়া দুই স্তন আর তারই মাঝে ফেলে রাখা নোংরা পাকানো শাড়ির আঁচলটা, সেটাও যেন ঠিক হয়নি। অথচ ঠিক করা দরকার। বাঁশের বাখারি চেঁছে দু তিন রকম সরু মোটা কাটি রাখা হয়েছিল। ওরই একটা নিয়ে রাশেদ নানির শরীরের আকার ঠিক করতে শুরু করল।

আর এভাবে যে কতক্ষণ কত সময় চলে গেছে খেয়াল নেই। খেয়াল হল হঠাৎই আবার শব্দ একটা কানে আসাতে। এবং শব্দটা টের পেয়েই সে চুপসে গেল। পারুল। পারুল কখন ফিরে এসেছে। এসেই দাঁড়িয়েছে তার পেছনে। রাশেদ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কিন্তু চোখ তার মাটির দিকে। মাটি দিয়ে গড়া মূর্তির শরীরে। কী জানি কী বলে বউটা। তার জিনিসে হাত দিয়েছে সে।

একটু সময় চুপচাপ। পরে আচমকাই একসময় পারুল যেন উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল।

বাহ্, কী সোন্দর! কে বানাইল?

পারুলের চোখ থেকে বিস্ময়ের ঘোর তখনও যায়নি। রাশেদের তৈরি মূর্তিটা সে খানিক আরও দেখতে দেখতে একসময় আবারও বলে উঠল, তুমি বানাইলা? কই কও নাই তো... তুমি বানাইতে পারো! কী সোন্দর.... এই বুড়ি কে? তোমার নানি নিকি!

হ, ঠিকই ধরছ। বানাইতে বানাইতে নানির কথাই মনে পড়ল—

কিন্তু মাটির পুতুল তুমি গড়ছ আগে? পারুলের চোখের মুগ্ধতা তখনও কাটেনি। মুগ্ধ হয়েই দেখছিল তখনও। রাশেদ জানাল, হ।

গড়ছিলা আগো?

লজ্জা পেয়েই রাশেদ মাথা নাড়ল আবার।

কে শিখাইছে তোমারে?

কে আবার শিখাইব। নিজে নিজেই শিখছি—রাশেদ হাসে একটু বোকা হাসি। এরপরেই জানায় কীভাবে সে পুতুল বানানো শিখেছে।

ছাড়া ছাড়া ভাবে বলছিল রাশেদ। বলতে বলতেই একসময় আবার থেমে গেল। আর ওই তখনই আস্তে আস্তে সেখানে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল পারুল, এই মূর্তিখান আমারে দিবা?

রাশেদ লজ্জা পায়। তার মাটি তার জিনিস সে শুধু বানিয়েছে মাত্র। তা বানালেই কি অধিকার জন্মে যায়? তাছাড়া বসেছিল, কাজ নেই তাই বানিয়েছে। কিন্তু যাবার সময় এটা নিয়ে তো যাবে না সে।

লজ্জা পেয়েই একসময় বলল, এই দেখ, নিবা তো নাও না। আমারে আবার জিগানের কী কাম—

বাহ্—জিগামু না! মাটির মূর্তিখান তো শুধুই পুতুল না.... তোমার নানি... নানির রূপ ফুটাইয়া তুলছ.... অহনে যদি হেইটা আমি চাই—

রাশেদ হাসে বোকার মতো। পরেই আবার জানায়, তুমি তো চাইতেই পারো। তোমার চাওনের অধিকার আছে.... হেইয়া ছাড়া—

বলতে গিয়ে রাশেদ চুপ করে যায়। সামান্য পরেই জানায়, যেমুন কইর‍্যা আমারে আশ্রয় দিছ..... তোমার কাছে আমার ঋণের শ্যাষ নাই—

বলছিল রাশেদ আর বলতে বলতেই আড়চোখে লক্ষ করছিল পারুলকে। কিন্তু মেয়েটির চোখ তখনও মূর্তির দিকে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল।

এবং দেখতে দেখতে যখন আবার চোখ সরিয়েছে সেই সময়েই কী নজরে পড়ায় থমকে তাকিয়েছে আবার পারুল।

এইয়া কী! রুটির বাটি রুটির লাখানই পইড়্যা আছে। খাও নাই?

খাওয়ার কথায় রাশেদের খেয়াল হয়। তাই তো! রুটির কথা তো মনে নেই তার!

ছি ছি ছি, অহনও খাও নাই..... বেলা কয়ডা হইছে খেয়াল আছে! আমি কত কইর‍্যা কইয়া গেলাম—

রাশেদের ঠোঁটের কোলে বোকা হাসিটা ঝুলেই ছিল। বলল যেন গলা নামিয়েই, একদম ভুইল্যা গেছি। খাওনের কথাডা আর মনেই ছিল না। খাড়াও অহনে খাইয়া লই—

থাউক! পারুলের মুখ যেন ভারী হয়ে আসে।

দুপের হইয়া গেছে। অহনে আর ওইসব খাইয়া কাম নাই। ভাত বসাইয়া আইছি। ভাত হইলেই.....

রুটির বাটির দিকে হাত বাড়িয়েছিল রাশেদ, পারুল সেটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েই উঠল। আর উঠতেই কে ডাকল বাইরে, নিত্যপদ—অ নিত্যপদ—

পারুলের মুখ শুকিয়ে যায়। বাটিটা ফেলে রেখেই সে ওঠে নিঃশব্দে। এরপর দাঁড়িয়েই চাপা গলায় বলে, চুপ কইর‍্যা থাকো এইহানে। শব্দ করবা না কিলান—

বলতে বলতেই পারুল বেরিয়ে যায়। পায়ের তলায় শব্দ ওঠে না কোনো।

দশ

হরপ্রসাদ এসে গুছিয়ে বসেছিলেন। আর বসতেই তিনি নিত্যপদর প্রশ্নের সামনে।

কী হইছে মাস্টারমশাই?

হরপ্রসাদ চুপ করে কী ভাবেন। পরেই একসময় জিজ্ঞেস করেন, আইচ্ছা নিত্যপদ তোমার মনে আছে কবে আমরা এইহানে আইছিলাম?

নিত্যপদ মনে মনে হিসেব করে। করতে করতেই সামান্য পরে জানায়, হ থাকব না ক্যান। খুব মনে আছে। কিন্তু হেই হগল লইয়্যা অহনে আবার কী করবেন?

না না, করুম না কিছু। আসলে বয়স হইছে তো.... কোনো কিছু আর ঠিকঠাক মনে থাকে না। সব কেমুন গোলমাল হইয়া যায়—

হ, তা তো হইবই। নিত্যপদ একবার পাশ ফিরতে গিয়েও আবার চিত হয়েই শুয়ে থাকে।

আইচ্ছা মাস্টারমশাই, কাইল নিকি ওইপার থন কে আইয়া ঢুকছে এইদিকে?

হ। হুনছি তো তাই—

ধরা পড়ছে?

কই, পড়ছে কইয়া হুনি নাই তো—

কাইল নিকি আবার গুলি-গোলা চলছে খুব? নিত্যপদ শুধোয়।

হরপ্রসাদ মাথা নাড়েন, হ। একজন বিডিআর নিকি মারাও গেছে। বর্ডার তাই বন্ধ আছে আইজ। চাইরদিকে একটা দমবন্ধ করা পরিবেশ—

নিত্যপদ হাত বাড়ায়, বউ—অ বউ—

পারুল ছিল কাছেই। শ্বশুরের ডাক শুনে মুহূর্তেই ছুটে আসে। এসে নিত্যপদর বাড়ানো থরথরে হাতটা ধরতেই নিত্যপদ বলে ওঠে, একবার উইঠ্যা

বসুম। মাস্টারমশাই আইছেন—

তা পারবেন বসতে?

পারুম পারুম। ঠিক পারুম—

পারুল অগত্যা তাকে ধরে বসায়। পেছনে একটা কোল বালিশও দেয়। নিত্যপদ উঠে বসে সেখানে। পরে বলে আন্দাজে, হরপ্রসাদের দিকে তাকিয়েই জানায়, মাঝে-মইদ্যে খুব কথা কইতে ইচ্ছা করে। বুঝলেন নি মাস্টারমশাই.... কিন্তু...

নিত্যপদ হঠাৎই যেন চুপ। এরপরেই কী মনে পড়ায় শুধোয়, হ কী কইতে আছিলেন য্যান...আমরা কবে আইছি এইহানে?

হ হ। হরপ্রসাদ চঞ্চল হয়ে ওঠেন, কবে য্যান আইছিলাম? একাত্তুরের বাংলা দ্যাশের মুক্তিযুদ্ধের আগে না পরে?

পরে। পরেই আইছি আমরা।

পরে আইছি—! হরপ্রসাদ যেন চুপসে যান।—ঠিক মনে আছে তোমার?

হ হ। নিত্যপদ মাথা দোলায়, ঠিক মনে আছে। মনে আছে জ্যষ্ঠি মাসের শেষদিকই ছিল। বর্ডার পার হইয়া আহনের সময় একজন ভারতীয় সেনা আমাগো বর্ডার পার কইর‍্যা রাস্তা দেখাইয়া দেয়। কী— মনে পড়ে নি মাস্টারমশাই?

হরপ্রসাদ ততক্ষণে চুপ। মনে মনে কী বিড়বিড় করে।

নিত্যপদ শুধোয়, কী হইল মাস্টারমশাই? বাক্য সরে না যে মুখে... এত কথা এত ঘটনা কিছুই মনে পড়ে না?

হ হ পড়ছে.... সবই মনে পড়ছে—হরপ্রসাদের গলা যেন শুকিয়ে আসে। সামান্য পরেই সে জানায়, তয় মনে পড়লে আর হইব কী! যা হওয়ার তা হইয়া গেছে—

হরপ্রসাদ যেন ভেঙেই পড়ে একরকম। নিত্যপদর সন্দেহ হয়। মানুষটার যেন কিছু হয়েছে। কিন্তু কী হয়েছে তা আর বুঝতে পারে না। একে অসুস্থ তার ওপর অন্ধ। ফলে হরপ্রসাদের মুখ চোখের ভাষাও পড়তে পারছে না সে। তবে সে যে বিচলিত এবং কোনও ব্যাপারে খুবই উদ্‌বিগ্ন তা তার কণ্ঠ থেকেই ধরা পড়ছে। কিন্তু কী হল আবার?

নিত্যপদ জিজ্ঞেস করে, মাস্টারমশাইরে য্যান চিন্তিত মনে হইতে আছে—

হরপ্রসাদ প্রথমে চুপ। চুপ করেই থাকে খানিকক্ষণ। পরে জানায় আস্তে আস্তে, হ–চিন্তা তো হওনেরই কথা। কাইল যা হুনলাম—

কী হুনছেন?

আমরা নাকি আর ইন্ডিয়ায় থাকতে পারুম না—

ক্যান! নিত্যপদ অবাক, হেইয়া আবার কী কথা!

হ, ঠিকই কথা। বর্ডারের এই দিকে পরিচয়পত্র চালু অইব এইবার। কিন্তু...

হেইয়া তো মাঝে মাঝেই হুনি। আবার সব থমকাইয়া যায়—

না, এইবার আর থমকাইব না। দুই চারদিনের মধ্যেই নাকি সরকারি লোকজন আইব পঞ্চায়েতের লোকজনেরে লইয়া। বাড়ি বাড়ি ঢুইক্যা র‍্যাশন কার্ড পরীক্ষা করব। আর একাত্তর সনের পরে পাওয়া র‍্যাশন কার্ড দেখলেই তা বাতিল করব। পরিচয়পত্র আর দিব না। হুনতে আছি আমগো নাকি পাঠাইয়া দিব আবার বাংলাদ্যাশে—

বাংলাদ্যাশে! নিত্যপদ মাথা নাড়ে। আন্দাজে হরপ্রসাদের দিকে তাকিয়েই আবার পাল্টা প্রশ্ন একটা ছুঁড়ে দেয়, কিন্তু পাঠাইব কোনহানে? ঘরবাড়িই তো নাই আমাগো। জ্বালাইয়া-জুলাইয়া দহল কইর‍্যা লইছে... ক্যান বাংলাদ্যাশ হওনের পর গেছিলাম না সংবাদ লইতে। ফিরা আইয়া কই নাই আপনারে?

হ তা কইছ। তয় অহনে যেমুন উইঠ্যা-পইর‍্যা লাগছে—। আবার হুনতে আছি হিন্দুগো সম্পত্তি-ও নাকি ফিরাইয়া দিব—

ধুর তাই হয় নিকি কখনও। দিব ক্যামনে? দেওনের সাহস আছে? সদিচ্ছা আছে—

হ। হেইয়াই অইল কথা—

বলতে বলতে চুপ করেই যান হরপ্রসাদ। নিত্যপদকে বসিয়ে দিয়ে পারুল চলে গিয়েছিল একসময়। টুকটাক কাজ সারতে সারতেই ফিরে এল এখন আবার। হরপ্রসাদের দিকে তাকিয়েই অল্প করে হেসেই শুধোল, জেঠা স্নান করছেন? তইলে দুইমুঠা খাইয়া যান—

নানা। না বউমা—স্নান সারি নাই অহন তরি। কুয়াশ কাটনের পর রোদের চিক উঠলে একবার বাইর অইছিলাম। ফেরনের সময় একবার তোমাগো এইখানে ঢুকছি। অহনে বাড়ি যামু স্নান-খাওয়া- দাওয়া সারুম....

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান হরপ্রসাদ।

পারুল আবারও বলে, ক্যান এইহানে সাইর‍্যা লন না। আমি জল তুইল্যা দিতে আছি টিউবল থিকা—

নানা, এইহানে পইড়্যা থাকলে বাড়িতে চিন্তা করব.... বুড়া অইছি তো অহনে বেশি বাইর অইতে দেয় না বাড়ি থন। হেইয়া ছাড়া তোমার হউরেরও তো স্নান খাওনের সময় হইল—

আইজ আর স্নান করামু না। মাথা মোছাইয়া দিমু। যা কাশ জমছে বুকে।

ত্যাল মালিশ করতে করতে অহনে নরম হইছে অনেকটা—

তয় তাই কর। আমি অহনে যাই। সময় পাইলে যাইও একবার আমাগো বাড়িতে—

হরপ্রসাদ হাত বাড়ান। একটু ঝুঁকে পরেই নিত্যপদর বাহুর দিকটা ধরে ফেলেন, যাই নিত্যপদ আবার আসুম খন—

নিত্যপদ তাকিয়েছিল। ঝট করে হাত একটা তুলে হাতটা বাড়িয়েই একসময় হরপ্রসাদকে আঁকড়ে ধরল।

পোলাটার খোঁজ পাইলেন নি মাস্টারমশাই? বছর ঘুইর‍্যা গেল অহনও সে....

আরও কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলতে আর পারল না নিত্যপদ। তার আগেই পারুল তাকে থামিয়ে দিয়েছে। মৃদু ধমকে বলেও উঠেছে, আহ্ আবারও হেই কথা বাবা। থাক না হেইসব—

হ, হ থাউক। পারুলের সমর্থনে বলেই হরপ্রসাদ আবার নিত্যপদর হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়েই দাঁড়ান। নিত্যপদ প্রসঙ্গ ঘোরায়। বলে, একটু সকাল সকাল আইয়েন মাস্টারমশাই। কথা কইতে বড় ইচ্ছা হয়—

আইচ্ছা তাই আসুম—

বলতে বলতে এরপর পেছনে ফিরে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়া থেকে নেমে তারপর হাঁটতে শুরু করেন। পড়েন হরপ্রসাদ।

হাঁটেন তবে পা যেন চলতেই চায় না। একে হাঁটুতে ব্যথা কোমরেও বাত তার ওপর কাল থেকে ওই এক দুশ্চিন্তা ঢুকেছে মাথায়। যদি সত্যিই তাদের পাঠিয়ে দেয় বাংলাদেশে? কিন্তু বাংলাদেশ কি আর নেবে? দেখতে দেখতে তাও তো হয়ে গেল প্রায় বছর আটত্রিশ উনচল্লিশ। যদিও বা নেয় তাদের বাংলাদেশ সরকার, কিন্তু খোকার চাকরি! চাকরি তো করে সে রায়গঞ্জে। সেচ আপিসে। কর্ণঝোরায়। তা চলে গেলে সে চাকরির কী হবে? তাবাদে মেয়েও তো দু দুটো আছে এই আশেপাশেই। বিয়ে দিয়েছেন তাদের কাছাকাছি হরপ্রসাদ।

ভাবতে ভাবতেই হাঁটছিলেন। নিত্যপদর ঘর থেকে তিন চারঘর পরেই তার ভিটে। রাস্তা সামান্যই। তবু ওই সামান্য পথটুকু যেন আর শেষ হতেই চায় না। হরপ্রসাদ পা টেনে টেনেই হাঁটতে থাকলেন।

কিন্তু বাড়িতে এসে ঢুকেছেন কী ঢোকেননি এই সময়েই মনোরমা বলে উঠল, কই গেছিলা? এই দুপুরতরি আহো না দেইখ্যা আমি তো চিন্তায় মরি। গেছিলা কই?

গেছিলাম কয়ডা সংবাদ লইতে। ফেরনের সোময় একবার নিত্যপদরে দেইখ্যা আইলাম। অবস্থা ভালা না। পোলা পোলা কইর‍্যা একদম পাগল হইয়া গেছে—

কিন্তু পোলা নিকি ফিরছে কাইল?

পোলা ফিরছে! কী কও তুমি? হরপ্রসাদ চমকে ওঠেন, ফিরলে একবার জানতে পারুম না? হেইয়া ছাড়া আহনের সোময় যেমুন কইর‍্যা পোলার কথা জিগাইল—

জিগাইল? মনোরমা অবাক।

হরপ্রসাদ বলেন, হ। পারুলও তো কাছে ছিল—

কী কও! মনোরমা বিড় বিড় করে, এইদিকে বউমা কয় দেখছে তারে—

হরপ্রসাদ চোখ তুললেন, কে দেখছে?

বউমা।

হরপ্রসাদ মাথা নাড়েন, নানা হেয় দেখব কী কইর‍্যা—

আইচ্ছা তুমি বউমারে জিগাও.....আইজই নিকি সকালে দেখছে—

কোনহানে দেখল? হরপ্রসাদের বিস্ময় ক্রমশ বাড়ছিল। মনোরমা জানাল, কী একটা সিলির কাম লইয়া পারুলর কাছে গেছিল বউমা। কিন্তু পিছ দিয়া ঢুকতে গিয়াই চমকে ওঠে। স্বজন তখন পিছ দরজায় বাঁশবাগান থিকা ঢুকল। দেইখ্যা বউমা আর খাড়ায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে আইয়া পড়ছে। পারুলর লগেও দেখা করে নাই—

আশ্চর্য কথা! হরপ্রসাদ থমকে তাকালেন, পোলা যদি ফিরব তয় নিত্য অমন কইর‍্যা আমার হাত জড়াইয়া পোলার খবর নিব ক্যান?

আইচ্ছা তুমি বউমারে জিগাও—

বলতে বলতে মনোরমা ঘরের ভেতরের দিকে মুখ ফেরায়, বউমা—বউমা—

সীতা সাড়া দিয়েছিল ভেতর থেকে। মুখ বাড়িয়ে দরজার কাছাকাছি হতেই হালকা স্বরে বলে উঠল, আমারে ডাহেন মা?

হ। একবার আহো দেহি?

সীতা বেরিয়ে এসে দাঁড়াতেই হরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করেন, কী বউমা—তুমি নিকি আইজ সকালে নিত্যর পোলারে দেখছ?

হ বাবা। দেইখ্যা তো আমি ভয়ই পাইয়া গেছি—

ক্যান!

কী জানি কেমুন চমকাইয়া গেলাম।

তুমি দ্যাখছ ঠিক?

হ বাবা। তয় গায়ের রঙটা একটু পুইড়্যা গেছে। হেয় তো গোরা আছিল—

হরপ্রসাদ ধন্দে পড়েন। যদি ছেলে এসেই থাকে তবে নিত্যপদ জানবে না কী রকম। তারওপর পারুলের মুখ দেখেও তো মনে হল না এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে ও-বাড়িতে! তবে কি এসেই চলে গেল স্বজন? হয়তো পারুলের সঙ্গে দেখা করেই চলে গেছে। বাপ জানে না এখনও। কিন্তু কেন? ভেবে ভেবেও কোনও উত্তর পেলেন না হরপ্রসাদ। স্বজন এসেছে ভাবতে যেন কষ্টই হল তার। আবার সীতার কথাকে উড়িয়ে দেবেন তাও পারছেন না একরকম।

কী যে বলবেন ভাবছিলেন, এমনই সময় মনোরমা হরপ্রসাদের চোখে চোখ রেখেই যেন বলে উঠল, কী এখনও নি সন্দ হয় তোমার?

কী জানি আমার মাথায় কিছু ঢুকতে আছে না বুঝলা। সব কেমুন গোলমাল পাকাইয়া গেছে—

এক কাম করুম? মনোরমা তাকায় স্বামীর দিকে।

কী কাম!

পারুলরে ডাইক্যা জিগাইলেই তো হয়। নিত্য ঠাকুরপো না জানলেও পারুল নিশ্চয়ই জানে সব—

হেইয়া তো বুঝলাম কিন্তু কও তো যে বাপ পোলার অপেক্ষায় থাইক্যা থাইক্যা চক্ষু দুইডা হারাইল হেই বাপেরে পারুল খবরটা জানাইব না ক্যান?

এক নাগাড়ে বলতে বলতে একবার যেন বুকের গভীর থেকে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস উঠে আসে হরপ্রসাদের। মনোরমা তখনই বলে, হ হেইয়াও তো কথা।

আমার কিন্তু মন কয় ভিন্ন কথা। হরপ্রসাদের চোখেমুখে দুশ্চিন্তা।

মনোরমা অবাক, কী কথা?

বউমা যারে দ্যাখছে বাঁশবাগানে হেই লোকটা নয়তো, যারে বিএসএফ খোজে—

কী কও গো? মনোরমা শিউরে উঠেছিল কিন্তু সীতা মাথা নাড়ল। শাশুড়ির কথার পিঠেই চটপট বলে উঠল, কিন্তু আমি যে পারুলদির সোয়ামিরে দেখছি—

হ তুমি ঠিকই দেখছ। তোমার দেখারে আমি সন্দ করি না তয় পোলাটা হয়তো এতদিন হেই দ্যাশে ছিল বিডিআরের হাতে ধরা পইড়্যা কাইলই ঢুকছে। কিন্তু খবর পাইয়া গেছে বিএসএফ। জানো তো..... হোনো তো রোজই বর্ডারের কথা—

মনোরমা ক্রমশ অবাক হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সীতা মানল না যুক্তিটা, তাই যদি হয় এমুন পলাইয়া ঢুকব ক্যান। এ গাঁয়ে তো সবাই চেনে স্বজনদারে....

এ কথায় হরপ্রসাদ আর কিছু বলতে পারেন না। বেলা হয়ে গিয়েছিল। চিন্তিত মুখে তিনি এগিয়ে যান। মনোরমা ও সীতার চোখাচুখি হন্। সীতাও আর দাঁড়ায় না। তবে ঘন্টা দেড় দুই বাদে গায়ে চাদর জড়িয়ে মাথায় ঘোমটা তুলে মনোরমার কাছে গিয়েই ফিসফিস করে বলে, আমি একবার আইতে আছি মা—

কই যাস?

পারুলদিগো বাড়ির থন একবার ঘুইর‍্যা আহি—

মনোরমা চমকে ওঠে। পরেই শুধায়, যাবি?

ক্যান, যামু না.... তুমি কী কও!

মনোরমার ভেতরে কৌতূহল ছিল আবার ভয়ও। যদি সত্যিই স্বজন ফিরে এসে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। একা বউটা যাচ্ছে। পরেই অবশ্য মনে হয় স্বজন তো অপরিচিত নয়। মনোরমাদের বাড়িতেও তো কত এসেছে। নানান ভেবে শেষপর্যন্ত অবশ্য বলে, তইলে যা কিন্তু তড়াতড়ি আসিস। আমি কিন্তু দুশ্চিন্তায় রইলাম—

না না, দুশ্চিন্তা করনের কিছু নাই। আমি যামু আর আহুম। সোনা উঠলে তুমি অরে সামলাইও—

সোনা সীতার ছেলে। মনোরমার নাতি। বছর চারেক বয়স। কিন্তু এই বয়সেই সে যা বায়নাবাজ, সীতা ছাড়া আর কেউ তাকে সামলাতেও পারে না।

মনোরমা বলল, ঠিক আছে। অর খাওনের জোগাড়টা কইর‍্যা গেছস তো—

হ ঢাকা দেওয়া আছে—

বলতে বলতেই সীতা নামে। মনোরমা সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই লক্ষ করে রোদের তেজ যেন মরে আসতে শুরু করেছে। এবারে হুড়মুড়িয়ে ঢুকবে আবার কুয়াশা। শেষবেলার দিকে তাকিয়ে মনোরমার ভেতরে যেন কী এক আলস্য ধরে যায়। ভেতরে ঢুকে একটু গড়াবার ইচ্ছে হলেও মনোরমা যায় না। চুপচাপ আলস্যধরা চোখেই বাইরে তাকিয়ে থাকে।

এগারো

পাখিদের আলাদা কোনো দেশ নেই। এই পৃথিবীটাই তাদের দেশ। তাদের ঘরবাড়ি। যে যেভাবে যেমন পরিবেশে থাকে সেখানে থাকতেই সে অভ্যস্থ। তবে তাই বলে তাদের ওপর কোনো বাধানিষেধ নেই। যেখানে খুশি সেখানেই তারা যেতে পারে। এই আকাশ তাদের অভিন্ন, ওই নদী-নালা-জল-জঙ্গলেও

তাদের সবারই আনাগোনা, আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষেও তাদের সমানাধিকার। ডাকো-গাও-চেঁচাও-আনন্দ কর বা বিষাদে ভাঙো কেউ তোমায় আটকাবে না। আটকায়ও না। পৃথিবী তাদের ছাড়পত্র দিয়েছে কেউ তাদের বাধাও দিতে পারবে না।

পারব মানে....এই কথাডা কেউ মনেও আনতে পারব না। পাখিগো আটকানোর কোনও আইন নাই। যত আইন দেখবি সব মানুষের লাইগ্যা। মানুষই মানুষরে থামানোর লাইগ্যা হেইসব বানাইছে, বুঝছস নি?

ঘাড় নেড়েছিল রাশেদ। অর্থাৎ সে বোঝেনি। তবে না বুঝলেও ব্রহ্মপুত্রের পাড় ধরে যেতে যেতে যেন মানুষটিকেই আবিষ্কার করছিল সেবারে। মাথায় টুপি চোখে চশমা পরনে একটা হাফ-প্যান্ট। আর সেই প্যান্টের গায়ে যে কত পকেট কত জেব। এক একটায় এক একটা থাকে। আর পিঠে থাকে একটা বড় ব্যাগ। ওই ব্যাগে পানি-টানি, খাবার-দাবার, কাগজপত্র আর বই-খাতা-কলম। আর আছে টিনের কৌটো আর সুদৃশ্য কাচের বোতলে সোনালি এক পানীয়।

সারাদিন পর জায়গা বেছে তাঁবু খাটিয়ে বসলে রোজই সেই বোতল থেকে একটু একটু করে গেলাসে ঢেলে চোখ বুজে খেত মানুষটা। পাশে থাকত কী একটা যন্ত্র। তাতে ভেসে আসত নানান পাখির সুর। কেউ ডাকছে সুর করে। কেউ কেবলই বেসুরো গলায়। আবার কেউ বা ডাকছে জলস্রোতের মতো শব্দ করে। কারো বা গলায় ঢেউয়ের শব্দ। কেউ বা আবার থেমে থেমে খুবই আস্তে। কেউ বা আবার একটানা, অনেকক্ষণ।

মানুষটা জিজ্ঞেস করত, ক তো রাশেইদা এইডা হইল কুন পাখি?

ইট সাজিয়ে লাকড়ি গুঁজে হয়তো বা তখন রান্না চাপিয়েছিল রাশেদ। ডাকটা শুনতে শুনতেই জানাত, এইডা তো সহেলির ডাক।

সহেলি? কেমুন পাখি রে?

লোকটা লালবর্ণ চোখ নিয়ে তাকাতেই রাশেদ উত্তর করত, খুব সোন্দর। হারা গাওখান লাইলে লাল। প্যাটে যেমুন ল্যাজেও তেমনি। হুদু কপাল, ঘেডি ও গলাখান কুচকুইচা কালা। তবে এইগুলি পুরুষ পক্ষী। মাইয়াগুলির গাওখান হলুদপানা। ডাক দেখছেন। কেমুন ডাকে টাইনা টাইনা। আপনে এই ডাক পাইলেন কই?

হেই সোন্দরবনের দিকে—

হ হেইদিকেই অরা থাকে বেশি। হেই পাখিগুলি কুমিররে ডরায় না... আবার হুনছি বাঘ দেখখ্যাও ডর নাই কোনো।

বাপরে বাপ, তুই দেহি পাখিরেও জানস?

রাশেদ হাসে। লজ্জা পায়।

মানুষটি হাতের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে রাশেদকে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু এইডা জানসনি পুরুষ পক্ষীগো গলায়ই শুদু গান থাকে। মাইয়া পক্ষীরা গান গায় না—

রাশেদ মাথা নাড়ে। অর্থাৎ সে এই তথ্যটি জানে না।

মানুষটি বলে তখন, তবু তর অনেক কিচ্ছু জানা আছে। এত জানলি কই থিকা?

এই দেহ জানুম না, ছেলেবেলা থিকাই তো পথে ঘাটে মানুষ। আমার নি কুনো ঘর আছে?

ছিল না?

ছিল। বলেই বিস্তারিত সবই জানায় রাশেদ। লোকটি তখন আপশোসের সুরে মুখে চুকচুক শব্দ করতে করতেই বলে, তয় তো তর কোনো দ্যাশ নাই। পাখিগো লাখান এই পৃথিবীই তর দ্যাশ। অহন থিকা তুই উড়বি কিলাম রাশেইদা। বুঝলি উড়বি। তইলে কেউ তরে আটকাইতে পারব না—

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় লোকটি। হাতে গেলাসটি নিয়েই ব্রহ্মপুত্রের চরে নেমে যায়।

উইদিকে যাইয়েন না কর্তা। সাপকোপ আছে—

মানুষটি থমকে তাকায়, কিন্তু আমার যে একবার সহেলির বাসায় যাওন লাগে?

সহেলির বাসায়! রাশেদ অবাক।

মানুষটি জানায়, হু। তর লাইগ্যা এক জোড়া পাখা ধার করুম। হেইয়ার পর তর পিঠে লাইইয়া দিমু। তইলে তুই উড়বি। উইড়্যা বর্ডার পার হবি। দেহি তরে আটকায় কে! তর দ্যাশ নাই মানে। পৃথিবী জোড়াই তর দ্যাশ—

রাশেদ টের পেয়েছিল মানুষটা আজ একটু বেশি নেশা করে ফেলেছে। ফলে দৌড়ে গিয়ে সে তাকে ধরে নিয়ে এসেছিল তাঁবুতে। এভাবেই রাত গেছে। পরে একসময় ফজরের আজান ভেসে এলে সে উঠে পড়েছিল। আর উঠতেই দেখে মানুষটাও তৈরি। পিঠে ব্যাগ, হাতে পাখি দেখার যন্ত্র। তাঁবু টাবু গুটিয়ে কাঁধে নিয়ে ততক্ষণে রাশেদও উঠে দাঁড়িয়েছে। এরপর আবারও হাঁটা শুরু। অদূরে জঙ্গল। জলাশয়। নদীও যেন আছে একটা। আর সে নদীর পাড়ে পাড়েই কত যে পাখি। টুনটুনি, ফুটফুটি, বাবু নাই, নীলটুনি। মানুষটা চোখে যন্ত্র লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গতকালের কথা যেন কিছু মনে নেই আর।

রাশেদরা হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে কখনও নৌকা, কখনও রিকশা।

এরপর আবারও তাঁবু ফেলা। পাখির ডাকের যন্ত্র। মানুষটির কী লিখে যাওয়া। তারপর আবারও পাগলামি ও জঙ্গলে ছুটে যাওয়া। নদীর ধারে পাখিদের গান শোনা।

বেশ ছিল রাশেদ। খাওয়া জুটছিল আবার লোকটার সঙ্গে ঘোরাও হচ্ছিল। কিন্তু এক সকালে ঘুম থেকে উঠেই মানুষটি তার কথা বলার যন্ত্রে কী শুনল। তারপর সব গুটিয়ে হুড়মুড় করে চলে গেল ঢাকা। ঢাকা থেকে নাকি আকাশে উড়বে সে। কিন্তু কী করে উড়বে? শুনে অবাক হয়ে মানুষটিকেই দেখেছিল সে। তার তো ডানা নেই। সে তবে যাবে কী করে! মানুষটি বুঝিয়ে বলেছিল। আর বলতে বলতেই জানিয়েছিল, খুব শিগগিরই আবার ফিরে আসবে সে। এসেই আবার জঙ্গলে ঘুরবে, জলাশয়ে ঘুরবে, নদীতে ঘুরবে। কেননা পাখিদের নিয়ে কাজ তার শেষ হয়নি এখনও। আর সেই কাজ শেষ করার জন্য তার রাশেদকে দরকার। কিন্তু পাবে কোথায় রাশেদকে। রাশেদের কোনো ঠিকানা নেই, তার কোনো ভিটে নেই, ঘর নেই। রাশেদের কোনও দেশ নেই। মানুষটি বলেছিল, ঠিক আছে সে শিগগিরি ফিরে আসবে। এসেই রাশেদকে একটা দেশের অধিকার দেবে।

রাশেদ কিছুই বোঝেনি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে শুধু মানুষটাকেই দেখেছিল। কিন্তু দেখলে কী হয় মানুষটা আর ফিরে আসেনি। এলেও রাশেদকে আর পাবে কী করে সে! যদি রাশেদের কোনো ভিটে থাকত কিংবা পাখিদের মতো কোথাও কোনো গাছ? তবে না হয়....

চোখ লাগিয়ে অনেকক্ষণ গাছটাকেই দেখছিল রাশেদ। ওই গাছটা এপারে না ওপারে! এতদূর থেকে সেভাবে কিছু বোঝা যায় না। আর বুঝেই বা হয় কী! এ-বর্ডারের চরিত্র বড় অদ্ভুত। এই বাড়িটা এপারের তো জানলা খুলে মুখ বাড়ালেই ওপারের বউটির মুখ দেখা যাবে তার বারান্দায়। আবার ওপার থেকে এসে দাঁড়িয়ে কথা না বলতে বলতেই ভুল করে এপারে পা। শুধু বেড়ার বদলে এখানে পিলার। ওই একটা পিলারের সংখ্যাই শুনেছিল পঁচাশি। ওর পাশ দিয়েই ঢুকে যেতে বলেছিল বিডিআরের জওয়ান দুজন। কিন্তু পিলারটা কোথায় তা আর জানা হয়ে ওঠেনি। কীভাবে হবে, সেই যে পরশু রাতের দিকে এসে ঢুকেছিল তারপর থেকেই তো এই এখানে বন্দি। বেরোবার চেষ্টা করেও এখনও পর্যন্ত বেরোতে পারেনি কোনোভাবে। মাঝে কেবল দু দুবার পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাঁশবাগানে এসেছিল প্রাকৃতিক কাজে। এবং অদূরের নির্জন দীঘিটিও ব্যবহার করেছিল। এর পরেই আবার ফিরে গেছে সেই অন্ধকার খুপরিটায়।

দেখছিল রাশেদ, হঠাৎই অবাক হল। ওই গাছটার মাথাটা যেন খুব জোরে জোরে দুলছে। কী হল, গাছের মাথায় কী তইলে বান্দর উঠল নাকি। বান্দরগুলি এক্কারে বজ্জাতের হাড়ি। গাছের মগডালে উইঠ্যা পাখির বাসা বিচরাইব। পাইলেই ভাইঙা ধপাস কইর‍্যা ফালাইব নীচে। ফালাইয়া মোখা নীচু কইর‍্যা মজা দেখব।

কিন্তু বাঁদরগুলো মজা দেখলেও পাখিদের বুকে তখন কান্না। কান্নায় যেন তুলতুলে গলাটাই বন্ধ হয়ে আসবে কখন।

একটানা অনেকক্ষণ ফুটোয় চোখ রেখেছিল রাশেদ। দেখার দুর্বার নেশায় নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না সে। আস্তে আস্তে একটু একটু করে জানালাটা সে খুলে দিল সামান্য। ফুটোয় চোখ রেখে আগেই সে দেখে নিয়েছিল বাইরেটা। এবারে খুলতেই অবাক হল। মুহূর্তেই প্রকৃতি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার চোখের সামনে। অদূরে কিছু ছোটোবড় ঝোপঝাড়। বনতুলসী, বাসক, কালকাসুন্দী। এরপরেও ছাড়া ছাড়া কিছু গাছপালা। বাঁশবাগান। বাগানটা পার হয়ে এরপরে শুরু হয়েছে আবারও ছোটো বড় নানা ধরনের বৃক্ষ। ওই তারই মধ্যে বেশ খানিকটা দূরে ওই গাছটা। অনুমান এবং গত পরশু রাতের স্মৃতি থেকে রাশেদ টের পেল, এদিকে এসেই কুয়াশার অন্ধকারে প্রথম এই টিনের বাড়ির গায়ে সে হাত রেখেছিল।

কিন্তু ওই গাছের ওপারে কি কাঁটাতারের বেড়া আছে! নাকি এপারে? না সেই গাছটার মতো, যার এদিকে বেড়া আবার ওদিকে বেড়া। মাঝে শুধু বেশ খানিকটা কৃষি জমির, ওপরেই ওই গাছটা। কী যেন জায়গাটার নাম? কী যেন নাম। নাহ্, ভেবে ভেবেও ঠিক নামটা মনে আনতে পারল না রাশেদ। তবে দেখে এসেছিল এপারে বেড়া। শক্ত পাকানো লোহার কাঁটাতারের বেড়ার এপারে দাঁড়িয়ে এপারের সীমান্তরক্ষী। মাঝে চাষবাসের ক্ষেত। অনুমতি নিয়ে যাদের জমি তারা যাচ্ছে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। হাল-বলদ সঙ্গে করে। আবার জমি চযে ফিরেও আসছে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। সঙ্গে ওই হালবলদ। একই ব্যাপার ঘটে আবার ধানকাটার সময়ে।

একবার ধানকাটার মরশুম। মফিজুদ্দিনের জমিতে ধান কাটতে নিয়ে গেল তাকে ওই মফিজুদ্দিন। সঙ্গে আরও জনা দশেক লেবার। আর লেবারদের মাথা পিছু পান্তা-কাঁচালঙ্কা-পেঁয়াজ আর আলুভর্তা।

ভয়ে ভয়েই ছিল রাশেদ। কিন্তু ঢুকতে কোনো অসুবিধেই হল না। মাথা গুণতি করে নাম ধাম লিখে মফিজুদ্দিনের দলের সঙ্গে সেও ঢুকে পড়ল ওই

নো-ম্যানস্ ল্যান্ডে। দুই পক্ষের মধ্যবর্তী এক অনধিকৃত ভূমিতে।

ধান কাটছিল রাশেদ। আর কাটতে কাটতে হঠাৎই অদূরে আবিষ্কার করেছিল ঝাঁকড়া মাথার ওই প্রকান্ড গাছটাকে। আর তার মাথায় কত পাখি। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল রাশেদ। দেখতে দেখতে ধানকাটার ফাঁকে বারবারই চোখ চলে যাচ্ছিল সেদিকে। পরে বিকেলের দিকে কী খেয়াল হওয়ায় আস্তে আস্তে সে চলে গিয়েছিল ওই ঝোপের পাশে গাছটার কাছে। গিয়ে দেখতে দেখতে কখন যে তার আকর্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। খেয়াল হতে টের পেয়েছিল চিৎকার। তার নাম ধরে মফিজুদ্দিনরা চেঁচাচ্ছে।

শীতের বেলা। সূর্য ডুবে গিয়েছিল। খেয়াল হতেই চটপট জমির আল ধরে হাঁটতে শুরু করেছিল রাশেদ। কিন্তু সামান্য যেতে না যেতেই গোলকধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল। মাঠ জুড়ে চারপাশে তখন ঘন কুয়াশা। সামনে সবই অস্পষ্ট। কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। তবে তারই ভেতরে কানে আসছিল মফিজুদ্দিনদের চিৎকার। চিৎকারটা লক্ষ্য করে সাড়াও দিয়েছিল রাশেদ। আর দিতে দিতেই এগিয়ে আসছিল। কিন্তু একটু পরেই লক্ষ করেছিল চিৎকারটা অস্পষ্ট হতে হতে একসময় মিলিয়ে যাচ্ছে আর সেও ঠিক ধরতে পারছে না ফেরার নিশানা। তবু সে আন্দাজেই এগোতে থাকল। আর এগোতে গিয়েই চোখে পড়ল অসংখ্য হলুদ আলো। কুয়াশার ভেতরে মাঠ জুড়ে খেলছে। রাশেদ ভয় পেয়ে গেল। সূর্যাস্তের ভেতরে পৌঁছুতে পারেনি সে। এখন গিয়ে উঠলেই তো ধরা পড়ে যাবে। সে কে, নাম কী তার? বাড়ি কোথায়? কোন গ্রাম? কোন জেলা? কোন থানা?

আন্দাজে তাই চুপচাপই হাঁটছিল রাশেদ। আর হাঁটতে হাঁটতেই একসময় সে টের পেল কাঁটাতারের বেড়া। বেড়া পেয়ে এরপর আবারও নিশ্চুপ সে দাঁড়িয়ে রইল। কান খাড়া করে কী শোনার চেষ্টা করল। পরে আস্তে আস্তে বেড়া ফাঁক করে সে গলে বেরিয়ে এল। বেরিয়েই হাঁটা। এবং হাঁটতে হাঁটতে একসময় একটা ভাঙাচোরা ধুলো ভর্তি রাস্তা পেয়েছিল সে। রাস্তার পাশেই পরিত্যক্ত একটা ভাঙা চালাও পেয়ে গিয়েছিল। কুয়াশায় আর অন্ধকারে কিছুই বুঝতে না পারায় সে রাতটা সে সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছিল। আরও পরে ভোর হলে এবং একসময় কুয়াশা কেটে সূর্য উঠলে রাশেদ টের পেয়েছিল সে ইন্ডিয়ায় ঢুকে পড়েছে। সেই প্রথমই তার ইন্ডিয়ায় ঢোকা। কিন্তু ঢুকলেও গাছটা যে কোথায় তা আর বার করতে পারেনি। তবে আবিষ্কার করতে না পারলেও গাছটাকে সে ভোলেনি। মাথার ভেতরে ডালপালাসহ তার ছবিটা সে ধরে রেখেছিল।

দেখতে দেখতে খেয়াল ছিল না। হঠাৎই চমকে উঠল একটা ঘর্ঘর আওয়াজে। চোখ তুলে জানালা দিয়ে তাকাতেই রাশেদ আবিষ্কার করল একটা উড়োজাহাজ। নীল আকাশে ডানা মেলে ওপারে যাচ্ছে। বুকটা ধড়াস করে কেঁপে উঠল রাশেদের। সেই মানুষ কি তবে ফিরল এবারে!

যতটা সম্ভব আকাশে চোখ রেখেই আকাশ পাখিটাকে সে দেখতে থাকল সময় নিয়ে।

বারো

দাওয়ার কাছে এসে উঁকিঝুঁকি মারছিল সীতা। একসময় আস্তে করে ডাকল, পারুলদি অ পারুলদি—

ডাক শুনেই পারুল বেরিয়ে এল। পরে সীতাকে দেখেই ঠোঁটে হাসি টানল, বাব্‌বা তুমি...! আসো আসো—অহন তো এইদিকে আসোই না?

কী কইর‍্যা আসুম কও। পোলায় যা জ্বালায় না... কারো কোলে যাইব না—

হ দুষ্টু বুঝি হইছে খুব!

খুব হইছে। বারান্দায় উঠে সীতা তাকাল এদিকে ওদিকে, কী কর?

কী আর করুম। ওই কুলার চিত্তিরটা শ্যাষ করতে আছিলাম। সদু পিসির ছুটো বুইনের মাইয়ার বিয়া। কুলা আর পিড়ি করতে দিছে আমারে। কাইল লইয়া যাইব—

সত্যি তুমি খুব ভালো আছো পারুলদি—

এ কথায় পারুলের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। সীতার নজর এড়ায় না তা। ফলে সঙ্গে-সঙ্গেই সে সামলে নেবার চেষ্টা করে।

না মানে একটা কিছু লইয়া আছো—

তা তো থাকতেই হইব... না হইলে সংসার চলব কেমনে?

বলতে বলতে বারান্দায় মাদুর একটা পেতে দেয় পারুল।

এহানেই বসি। ঘরের ভিতরে যা কনকইন্যা ঠান্ডা। ল্যাপ-কম্বলেও ঠান্ডা যায় না। তবু তো আমরা সামলাইতে পারি। কিন্তু বুড়া মাইনষের কথাটা ভাবো তো। হউরের তো আবার ঠান্ডার ধাত।

হ, বাবায় কইল গিয়া। নিত্য কাকার শরীল য্যান আরও কাহিল হইয়া গেছে—

কী করুম কও। আমি তো আমার সাইধ্যমতো করতে আছি। হয়তো ট্যাকা-পয়সা খরচা করতে পারলে কইলকাতায় লইয়া গিয়া সুস্থ কইর‍্যা আনন যাইত। চক্ষুও হয়তো ফিরত। কিন্তু—

মাদুরের ওপরে পা ভাঁজ করে বসে পড়েছিল সীতা। বসে পড়ে বলল, তবু তুমি যা কর এমুন কেউ করে না। পাড়ার লোকে তো কয়.... নিত্য কাকা বাইচ্যা আছে শুধু তোমার লাইগ্যা—

সীতার মুখোমুখি মাদুরের এক পাশে পারুলও বসে পড়েছিল সীতার এ-কথায় চোখজোড়া সামান্য ছলছলে হয়ে উঠল, তবু কিছুই তো করতে পারি না তেমন। এই যে কাশ লইয়া কয়দিন ধইর‍্যা ঘরে পইড়্যা আছে... ডাক্তার নি দেখাইতে পারতে আছি.... ওই আদা-রসুনের তেল ফুটাইয়া মালিশ কইর‍্যা কইর‍্যা....

বলতে গিয়ে চুপ করে যায় একসময় পারুল। এরপর সীতার দিকে তাকিয়ে কী লক্ষ করেই জিজ্ঞেস করে, তা তোমার সংবাদ কী! বর আছে কেমুন?

আছে ভালোই। সলজ্জ স্বরে উত্তর সীতার।

পারুল শুধোয়, আইব কবে?

চিঠিতে তো জানাইছে সামনের শনিবারে আইব। থাকব কইদিন—

তয় তো তোমারে আর পাওন যাইব না কয়দিন...

আহা, কী যে কও! সীতার মুখটা আচমকা রক্তরাঙা হয়ে ওঠে। পারুল তা লক্ষ করেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

সীতা বলে, পারুলদি তুমি আমারে একটা জিনিস দেখাইয়া দিবা। কিছুতেই ঘর মিলাইতে পারতে আছি না—

পারুল অবাক হয়ে চোখ তোলে, কী জিনিস রে!

এবারে আবার আগের মতোই সপ্রতিভ সে। সীতা তার চাদরের তলা থেকে একটা বড় প্ল্যাস্টিক প্যাকেট বার করে আনে। তাতে উলের বল একটা। কমলা রঙের। সেই সঙ্গে কাঁটা দুটো। তাতে খানিকটা উল বোনা রয়েছে।

এই দেখ না, বুকের কাছটা কিছুতেই মিলাইতে পারতে আছি না। খালি ঘর পইর‍্যা যায়।

পারুল আড়চোখে তাকায়, এইটা কার, বরের নিকি?

সীতার ঠোঁটে সলজ্জ হাসি।

নানা এইয়া তো ঠিক না। পারুল বলে, বরের বুক ক্যান বারবার পইর‍্যা যাইব—

সীতার গাল আরক্ত হয়ে ওঠে, আহা তুমি না পারুলদি—

পারুল প্যাকেটটা হাতে নিয়ে কাঁটা দুটো বের করে। তারপর সীতার কাছে ডিজাইনটা বুঝে নিয়েই দেখিয়ে দেয়। ফর্সা দুই হাতে আঙুলগুলো তার ঝড়ের বেগে ওঠানামা করতে থাকে।

একসময় দেখতে দেখতেই সীতা শুধোয়, আইচ্ছা পারুলদি—একখান কথা জিগামু?

কী কথা! পারুলের চোখ কাঁটার দিকে। বুনতে বুনতে একবার যেন সীতার দিকে চোখও তুলল।

সীতা সতর্ক, তুমি সিন্দুর পর না ক্যান গো?

পারুল চুপ। একটু যেন গম্ভীরও হয়ে যায়। সীতা তা লক্ষ করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে এরপর, জিগাইলাম বইল্যা রাগ করলা?

পারুল মাথা নাড়ে। এরপর বুক থেকে একটা বড় নিঃশ্বাস পড়ে তার, নাহ্। রাগ করুম ক্যান? এইয়া কি রাগের কথা—

না তবুও.... সীতা অস্পষ্ট স্বরে জানায়, এমুন একখান কথা...

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই সীতা চুপ করে যায়। পারুল বলে একটু পরে, তা পইর‍্যা কী হইব কও। সবই তো শ্যাষ হইয়া গেছে—

কিন্তু—

পারুল তাকায়, কিন্তু কী?

না থাক তুমি দুঃখ পাইবা। আমারই উচিত হয় নাই কথাটা তোলা। আসলে তোমারে এমুন দেখতে ভালো লাগে না তাই...

কিন্তু ভালো লাগার জন্যই কি শুদাশুদি কপালে সিন্দুর পরুম। হাতে শাখা রাখুম—

শুদাশুদি কইতে আছো ক্যান? স্বজনদা তো আর উধাও হইয়া যায় নাই। হঠাৎ যদি আইস্না পড়ে—

না না—পারুল আবারও মাথা নাড়ে, হেই সুখ আমার কপালে নাই।

নাই ক্যান কও। হেইয়া ছাড়া নিরুদ্দেশের পর বারো বচ্ছর কাইট্যা গেলে না হয়...

পারুল থমকে তাকায়, বারো বচ্ছর.... তোমারে কে কইল?

আড়ষ্ট হয়েই সীতা জানায়, হউরের মুখেই য্যান হুনছিলাম কয়দিন আগে—

পারুল কিছু বলে না। পরে হাসে একটু শব্দ না করে, বারো ক্যান বাইশেও সে আইব না... আমি নিশ্চিত—

সীতার মুখে কথা নেই। কী ভাবছিল। পরে শুধোল, তয় যে হাতে লোহা পর?

হেইয়া লোক দেখানোর লাইগ্যা... না হইলে হউরের কানে কেউ না কেউ তুলবই—। আসলে হউরে তো জানে, সে গেছে তার ব্যবসার কাজে কোথাও....ফিরা আইব একদিন। আর হউরের যদি চক্ষু থাকত তইলে আমারে

সিন্দুরও পইর‍্যা থাকতে হইত এতদিন—

সীতা চমকে ওঠে। কী বলছে পারুলদি! তবে সকালে যাকে দেখল সে কি পারুলদির বর নয়? আর যদি ফিরে আসে তাহলে কি এখনও এমন বিমর্ষ থাকে পারুলদি! সীতার সব গোলমাল হয়ে যায়। নিছকই এক কৌতূহল বশে সে বেরিয়ে এসেছে দুপুরেই, সন্দেহ নিরসনের জন্য। নাহলে উল বোনার ব্যাপারটা এত জরুরি ছিল না যে সকালে না পেয়ে দুপুরেই আবার পারুলকে ধরতে হবে। কিন্তু সে যাকে দেখল সে তবে কে? সে কি স্বজনদা নয়! কিন্তু সেই নাক সেই চোখ আর সেরকমই লম্বা-চওড়া চেহারা।

সীতা ধন্দে পড়ে। মনের ভেতরে তার ঝড় উঠেছে প্রবল হাওয়া তুলে। পারুলদিকে কি জিজ্ঞেস করবে? কিন্তু যদি কিছু মনে করে বসে? তারচেয়ে বড় কথা, দেখেছে যে তা প্রমাণ করবে কী করে! তার চেয়ে চলে যাওয়াই ভালো। ভেতরে ভেতরে এতক্ষণে যেন ভয়ও এসে গেল একটা সীতার। সে যাকে দেখল সে তবে কে? পারুলদির বর, নাহলে এত সাবলীলভাবেই বা পেছনের দরজা দিয়ে মানুষটা ঢুকবে কী করে!

পারুলের বোনা হয়ে গিয়েছিল। সীতাকে সে এবারে সামনের পিঠের ঘর তোলার নিয়মটা দেখিয়েই জানাল, খাড়াও বহো একটু। হউরকে একবার দেইখ্যা আসি। অনেকক্ষণ থিকা কোনো সাড়া নাই—

একবার উঠে দেখে এসে আবার বসতেই সীতা ওঠার উপক্রম করে।

আমি অহনে আসি পারুলদি—

বহো না আর একটু। পারুল জানায়, হারাদিনই ঘরটার মইধ্যে বন্দী হইয়া থাকি। কথা কওনের লোক পাই না। ব্যাইচা আছি শুধু দোকানটা আছে বইল্যা—

সীতার মুখে এসে গিয়েছিল। হঠাৎই সে মুখ ফসকে বলে ফেলল, আমি না সকালের দিকে আইছিলাম একবার—

সকালের দিকে! পারুল অবাক, কখন? আমি ছিলাম না?

জানি না। আমি আর তোমারে ডাকি নাই? সীতার গলা শুকিয়ে ওঠে।

সে কী! পারুল অবাক, না ডাইক্যাই চইল্যা গেলা! ক্যান?

সীতা ইতস্তত করে। পরে কী হয় একসময় সে বলেই ফেলে, আসলে সামুন দিয়া অনেকটা ঘোরন হয় বইল্যা আমি পিছ দরজার দিকে আইছিলাম। বাঁশবাগানের ভিতর দিয়া...হঠাৎই দেখি—

বলতে বলতেই সীতা থামে একবার। পরেই পারুলকে জানায় ব্যাপারটা। বলে সে, ওই সময়ই বাঁশবাগান থেকে ভেতরে যেতে দেখেছে স্বজনদাকে সে।

পারুল চমকে ওঠে। একবার যেন আড়চোখে রাস্তার দিকেও তাকায়।

সীতা লক্ষ করছিল। একসময় জানায়, আমি আর তাই ডাকি নাই। ভাবলাম, এ্যাতোদিন পরে আইছে....

একটু থেমেই ঢোক গিলে সীতা জানায়, পাড়ায় কেউ জানে না অহনো—না পারুলদি?

পারুল চুপসে গিয়েছিল। সীতার কথায় বুঝেছে আজ সকালে সীতা নিশ্চয়ই ওই লোকটাকে দেখে ফেলেছে। কিন্তু স্বজনের সঙ্গে এত মিল যে দূর থেকে তাকিয়ে এক ঝলক দেখে আর বুঝতে পারেনি।

চুপ করেই ছিল পারুল। সীতা উঠল, নাহ্ আমি যাই পারুলদি। পোলায় বোধায় উইঠ্যা পড়ছে এতক্ষণে—

বলতে বলতে এগিয়েই গিয়েছিল একটু। এই সময়ে পারুল তাকে ডেকে দাঁড় করাল, সীতা—

সীতা পেছনে ফিরতেই পারুল জানায়, সংবাদটা আর কেউ জানে?

হ। সীতা জানায় চাপাস্বরে।

কে? পারুলের গলাও যেন ততক্ষণে খাদে নেমে এসেছে, আর কারে কইছ কও তো?

মা-য় আর বাবায় জানে—

কে! হরজেঠা! কিন্তু—একটু থেমেই পারুল জিজ্ঞেস করে, দুপুরে আইল কই কিছু জিগাইল না তো?

হউর জানে নাই তহনো—সীতা জানাল অস্ফুট গলায়, মায়রে কওনে মায়-ই তারে জানাইছে। কিন্তু বাবায় বিশ্বাস যায় নাই—

ক্যান? পারুল চমকে তাকায়।

বাবায় কয় এত বড় একখান সংবাদ কি আর নিত্যর কাছে চাইপ্যা রাখব নাকি পারুল। আর রাখবই বা ক্যান? এমুন একখান আনন্দের খবর....

হরজেঠা ঠিকই কইছে—বলতে বলতে এই প্রথমই পারুলের চোখ ছলছল করে উঠল। কান্নার মতো কিছু একটা উঠে আসছিল বুক থেকে গলার কাছে। গলাটা একটু চেপেই পারুল হঠাৎ ভেঙে পড়ল। চাপা কান্নায়ই বলল একটু পরে, নানা হেয় না... হেয় আসে নাই—

সীতা অবাক, তইলে?

একটু সামলে নিয়ে পারুল তাকে ভেতরের দিকে আসতে বলে। সীতা এলে তাকে জানায়, লোকটা আসলে অনুপ্রবেশকারী। রাতের অন্ধকারে বিডিআর তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে এদিকের বর্ডার পার করিয়ে। কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক গলিয়ে।

বলতে বলতে গতকাল সকালের ঘটনা থেকে সবটাই সে বলে সীতাকে

এমন কী সে যে ঘরে ঢুকে তার মুখ চেপে ধরেছিল সেটা জানাতেও ভুল করে না। কিন্তু মুখ চেপে ধরলেও সে চেঁচাতে পারেনি। কেননা সে ততক্ষণে চমকে উঠেছে সামনে আর একজন স্বজনকে দেখে। এত মিল!

কান্না ভাঙা গলায় থেমে থেমে বলছিল পারুল। হঠাৎই ভেতরে কাশির শব্দ। নিত্যপদর গলায় কাশি উঠে এসেছে। পারুল সতর্ক হল। সঙ্গে সঙ্গে গায়ের চাদরটা চোখে তুলে চোখের আলগা জলটুকু চেপে মুছে নিয়েই বলল, ততক্ষণে সে আমার প্রায় পাওখান ধরতেই বাকি রাখছে। কইছে সে চইল্যা যাইব তয় আমি য্যান তারে বিএসএফের হাতে তুইল্যা না দিই। ক্যান না বিএসএফের তাড়া খাইয়াই সে হঠাৎ ঢুইক্যা পড়ছে আমগো বাড়িতে। বিএসএফ পাড়া ছাড়লেই সে চইল্যা যাইব।

সীতা শুনছিল আড়ষ্ট হয়ে। হঠাৎই সে এপাশে ওপাশে তাকিয়ে শুধোল, তয় কি লোকটা তোমগো বাড়িতে লুকাইয়া আছে?

অনুমানে টের পেল পারুল, এ কথাটা সত্যি বললে পাড়ায় আর থাকতে পারবে না সে! তার শ্বশুরকে এসে ধরবে সবাই, ঘরে যুবতী বউ থাকা সত্ত্বেও একটা উটকো পালিয়ে আসা লোক কী করে থাকে তার বাড়িতে? পারুল, তাই দেরি করে না। উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়েই জানায়, না না সেইয়া হইতে দিমু নিকি! লোকটা আছে বাঁশবাগানের আন্ধারে লুকাইয়া। হয়তো চইল্যাও যাইত কিন্তু কাইল রাতে বর্ডারে খুব গুলি-গোলা চলছে। আর পাড়ার মইধ্যে বিএসএফের জওয়ানগুলিও ঘোরাঘুরি করতে আছে তাই হয়তো অহনও লুকাইয়া আছে বাঁশবাগানে—

বাব্বা তোমার কী সাহস গো পারুলদি? যদি ঘরে ঢুইক্যা পড়ে। সীতা ভয়ে ভয়ে তাকায় আবারও চারপাশে।

পারুল জানায়, ঘর বলতে বারান্দায় তো উইঠ্যা আইছিল। তারপর একসময় নাইম্যা গেছে।

যদি আবার ওঠে?

আর উঠব না। তোমার মতো আমিও সকালের দিকে একবার দেখছিলাম বাঁশবাগানে। তড়াতড়ি আইয়া পিছ দরজায় খিল লাগাইয়া দিছি। বাব্বা যা কান্ড....

তুমি বিএসএফরে জানাইয়া দাও পারুলদি... শ্যাষে কী থিকা কী হইয়া যায়! আমার তো হুইন্যাই কেমন বুকে কাঁপন লাগছে। না গো আমি যাই পারুলদি—

বলেই আর দেরি করে না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়িয়েই সে বারান্দা থেকে নেমে যায়, আসি গো পারুলদি—

পারুলও বারান্দার খুঁটি ধরে নেমে দাঁড়ায়, আমি যামু তোমার লগে?
না না, আমি পারুম—
ভয়ে ভয়ে প্রায় উর্দ্ধশ্বাসেই দৌড়তে থাকে যেন সীতা।

তেরো

বাস এসে দাঁড়াল লাইনের ওপারে। বাংলা-হিলির একেবারে শেষ সীমানায়। দাঁড়াতেই যাত্রীদের হুটোপুটি। হুড়মুড় করে নেমে তাদের অনেককেই যেতে হবে এখন বাংলাদেশ অভিভাসন দপ্তরে। যারা এপার থেকে ওপারে গিয়েছিলেন ভারতীয় চেক-পোস্টের 'এগজিট' ছাপ নিয়ে, ফেরার পথে সেই তাদেরই বাংলাদেশ অভিভাসন দপ্তরে গিয়ে পাসপোর্টে 'ডিপারচার'-এর স্ট্যাম্প বসিয়ে তারিখ লিখে সই করিয়ে নিতে হবে এখন। তবেই না বেরোনো, বেরোতে পারা। তাও কী, অভিভাসন দপ্তর হলেই শুধু হবে না এরপর শুল্ক বিভাগেরও ছাড়পত্র দরকার। যা আনা ন্যায়ত তার বাইরে কিছু আনা হয়নি তো, যা আনা আইনসঙ্গত তার বাইরে কিছু নেওয়া হয়নি তো! এরপরেও আছে আরও। যাত্রীরা ভ্রমণ-কর দিয়েছেন তো! যারা এপার থেকে ওপারে যাওয়ার সময় হাকিমপুর শাখার সোনালি ব্যাঙ্কে বিদেশ ভ্রমণ-কর দিয়েছেন তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যারা দেননি! না দিয়ে থাকলে সেটাও মিটিয়ে দিতে হবে এখুনি, তবেই না বেরিয়ে আসা।

কিন্তু বাসটা এল কোথা থেকে! ঢাকা না রংপুর? নাকি জামালপুর থেকেই এল এখানে সরাসরি।

নগেন তাকাল। এবং তাকিয়েই বুঝল ঢাকা। ঢাকা থেকেই এসেছে। কিন্তু এলেও আজ বর্ডারে তেমন জুত নেই। প্রায় সবই শুনসান। কাল রাতে বর্ডারের এই জায়গাটা ছেড়ে খানিকদূরে বিএসএফ ও বিডিআর-এর মধ্যে প্রচন্ড গুলি চালাচালি হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এতে একজন বিডিআর নাকি মারাও গেছে। ওপারের বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর সঙ্গে এপারের বর্ডার সিকিরিউটি ফোর্সের মুখ দেখাদেখিও প্রায় বন্ধ আজ সকাল থেকে। হয়তো বন্ধই হয়ে যেত পুরোপুরি, কিন্তু যাত্রী পারাপারের জন্যই এটুকু খোলা রাখা দরকার। তাই-ই রাখা হয়েছে খোলা। নাহলে আজ সকাল থেকে এই বেলা তিনটে পর্যন্ত বর্ডারে তেমন লোকজনও নেই যেন। দোকানে তাই বিক্রিবাটাও কম।

নীচু হয়ে কেনাবেচার হিসেবটিসেব করছিল নেবেন এই সময়ে দোকানে এসে কে দাঁড়ায়।

দাদা, ভালো তো?

কে! মুখ তুলে তাকাতেই নগেন চিনতে পারল। কী যেন নাম বলেছিলেন। সঙ্গে আরও একজন আছে। কলকাতা থেকে এসেছেন। দুজনেই লেখক। মনে আছে নগেনের। ঢাকায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কী এক আলোচনাসভায় এঁরা দুজনেই ভারত থেকে আমন্ত্রিত অতিথি। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক। ঢাকায় যাচ্ছেন হিলি সীমান্ত দিয়ে কিন্তু কেন? বেনাপোল-হরিদাসপুর বর্ডার দিয়ে গেলে তো এত ঘুরতে হয় না বলে শুনেছে নগেন। সোজা কলকাতা থেকে ঢাকার বাস আছে। ট্রেনও আছে। কলকাতা থেকে ছেড়ে সোজা দর্শনা হয়ে ঢাকা। কমলাপুর স্টেশনে নামিয়ে দেবে। সেখান থেকে সাভারের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তো কাছেই শুনেছে। তবে হিলি বর্ডার দিয়ে কেন? এ-প্রশ্নে জবাবও দিয়েছিলেন ফর্সা মতো ওই মানুষটি। হিলি দিয়ে ঢোকার কারণ, রংপুর সাহিত্য-সম্মেলন। সেখানেও আমন্ত্রিত অতিথি তাঁরা। এবং আসবেনও সেখানে ঢাকা ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল জামালপুর থেকে অনেক বাংলাদেশের লেখক ও কবিরা। সেখান থেকেই এঁরা ঢাকায় পাড়ি দেবেন। আবার ঢাকা থেকে ফেরার সময় হিলি বর্ডার। মনে পড়েছে সবই নগেনের। আরও মনে পড়েছে, এখানে এসে তার দোকানের সামনে একটা ভাড়া গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে নগেনকে দেখেই প্রথমে হাসিমুখে এগিয়ে এসেছিলেন সেদিন ওই ফর্সা মতোন কন্দর্পকান্তি মানুষটি।

দাদা, প্রথম এলাম। বর্ডার পার হব। কী করতে হবে এবারে!

নগেন জানিয়েছিল ভারতীয় চেক পোস্টের কথা। শুল্ক দপ্তরের কথা। জানিয়েছিল মানি-চেঞ্জিং-এর কথা। এবং তারপর একজনকে দিয়েছিল সঙ্গে। একটি স্থানীয় ছেলেকে। ওই ছেলেটিই সব করিয়ে দিয়েছিল তাদের। অবশ্য যাওয়ার সময় ছেলেটিকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে টাকাও কিছু দিতে চেয়েছিলেন মানুষটি। কিন্তু পিন্টু সেটা নেয়নি। ওই যাওয়ার সময়ই নিয়মবিধি সারার ফাঁকে যেটুকু সময় ছিল তাতেই মানুষটি আলাপ জুড়ে দিয়েছিলেন নগেনের সঙ্গে। আর নগেনেরও ভালো লেগেছিল। ভালো লাগায় বর্ডারের লাইন পার হওয়ার সময় দোকানে পিন্টুকে বসিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল নগেন। যেতে যেতে বলেছিল, বর্ডার পার হয়েই কিন্তু এখানে যা যা নিয়ম সারলেন ওখানেও আবার তাই তাই করতে হবে।

কেন!

সঙ্গের মানুষটি বলতেই নগেন জানিয়েছিল, এইহানে যা করলেন হেইডা ভারতের। আবার ওইহানে যা করবেন সেইডা বাংলাদ্যাশের।

বলতে বলতেই জিজ্ঞেস করেছিল নগেন, তা হেইপাড়ে গিয়া বাস ধরতে

হইব না আপনেগো?

হ্যাঁ। কী ব্যবস্থা করেছে ওরা কে জানে? গাড়ি তো পাঠাবার কথা বলেছে।

বলতে গিয়েই ফর্সা মানুষটির চোখ গিয়েছিল ওপারে। যেতেই তিনি উচ্ছ্বসিত।

ওই যে, মহফিল হক এসে গেছেন। ওই দেখুন হাত নাড়ছে ওপার থেকে—

এবং নগেন তখনই লক্ষ করেছিল একজন বয়স্ক মানুষ। হাত তুলে ফর্সা মতোন মানুষটিকে জানান দিচ্ছেন তিনি এসে গেছেন।

নগেন জিজ্ঞেস করেছিল, মহফিল হক কে?

রংপুরে থাকেন। বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত কবি। অনেক কবিতার বই আছে—

তইলে তো অসুবিধা হওনের কাম নাই—

নগেন বলেছিল। আর বলতে বলতেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল চেকপোস্টের কাছে। আর সে যেতে পারবে না। আর তার যাওয়ার অধিকার নেই। অথচ চেক-পোস্টের ওপারে ওই যে মাটি ওই মাটিতেই তার পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছিল একদা। একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধের সময় চলে আসতে হয় তাদের। নগেনের তখন বছর চারেকই বয়স হবে বোধহয়। একটু হলেও বুকটা বুঝি-বা ছাঁৎ করে উঠেছিল নগেনের। নগেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আর ওই তখনই মানুষটি। নিজের নাম জানিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ফেরার সময় দেখা করে যাবেন। নগেন আপ্লুত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কী যে নাম বলেছিলেন তা আর মনে নেই। নগেন লজ্জায় পড়ে। তবুও তা ভুলে গিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

আহেন দাদা, আহেন—

চিনতে পারছেন তো?

ও মা চিনুম না। নগেন সহজ হওয়ার চেষ্টা করে, দিন পনেরো আগের কথা... এরই মইধ্যে ভুইল্যা যামু...! তয় হ, সত্যি কথা কই আপনের নামটা কিন্তু মনে নাই দাদা—। কিছু মনে কইরেন না।

না না, মনে করব কেন! একদিনের একটু পরিচয় তাতে কী আর নাম মনে থাকে! চিনতে যে পেরেছেন এই যথেষ্ট। আচ্ছা দাঁড়ান—

বলে কাঁধের চামড়ার ব্যাগ থেকে একটা বই বার করে আনেন মানুষটি। তারপর তাতে তার নামটা লিখে বইটা ওর হাতে দিয়ে বললেন, এই নিন আমার একটা গল্পের বই। ঢাকা থেকে বেরিয়েছে। আপনাকে দিলাম। পড়ে দেখবেন যদি ভালো লাগে—

নানা দাদা—নিশ্চয়ই পইড়্যা ফালামু। পইড়্যা আপনারে জানামু। আপনের ঠিকানা দ্যান—

মানুষটি বইয়ের ওখানেই নগেনের নিজের সই করা নামের তলায় ঠিকানা এবং ফোননম্বর লিখে দিয়ে বইটা ওর হাতে তুলে দেন। এবং ওই তখনই নামটা দেখতে গিয়ে মনে পড়ে নগেনের। শরণ। শরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

তা শরণ ততক্ষণে বলে উঠেছেন, কী ব্যাপার বলুন তো দাদা। বর্ডারটা আজ যেন চুপচাপ। কেমন ঝুম মেরে পড়ে আছে। যাওয়ার দিনও দেখেছিলাম কী জমজমাট। হইচই। ট্রেন যাচ্ছে।

নানা, ট্রেন যাইব। তয় কাইল রাতে খুব গুলি-গোলা চলছে—

গুলি?

হ।

কারা চালাল?

ওই বিডিআর এবং বিএসএফ। কথাটা এবার নীচু সুরেই বলে নগেন।

শরণ জিজ্ঞেস করেন, কী নিজেদের মধ্যেই?

হ।

কেউ হতাহত হয়েছে?

হুনতে আছি একজন বিডিআর মারা গেছে—

তা দোকান খুলে রেখেছেন অসুবিধে হচ্ছে না?

অসুবিধার আরকী! আমাগো কাছে এইসব জলভাত। ছোটো বয়স থিকাই দেখতে আছি—নগেনের ঠোঁটে এক চিলতে হাসি। বলে এরপর, তা আপনগো বাংলাদ্যাশ সফর ভালা অইল?

হ্যাঁ, বেশ ভালো লাগল। এবারে তো নিজের ভিটেও দেখে এলাম—

নগেন অবাক, আপনেগো দ্যাশ কি হেইপাড়ে নিকি?

হ্যাঁ। ঢাকায়।

ঢাকার কোনহানে?

নারায়ণগঞ্জ।

অহন তো নারায়ণগঞ্জ শহর হইয়া গেছে। তা আপনেরা দ্যাশ ছাড়ছেন বোধহয় অনেককাল হইল?

হ্যাঁ অনেকবছর। সাতচল্লিশে দেশভাগের পর। তবে আমার জন্ম এপারে। কলকাতায়।

নারায়ণগঞ্জে কেউ কি আছে নিকি অহন?

নানা। কে আর থাকবে?

তয় ভিটেমাটি! নগেন শুধোয়।

সব দখল হয়ে গেছে। একজনকে বলায় সে আমার ঠাকুর্দাকে চিনতে পারল। সেই নিয়ে দেখিয়ে দেয়—

ভিতরে ঢুকছিলেন?

না বাইরে থেকেই দেখেছি—

দখলদার দেহে নাই? নগেন তাকায় আড়চোখে।

শরণ অবাক, কেন বলুন তো?

না অহন তো হিন্দু-সম্পত্তি ফেরত দেওনের লাইগ্যা নিকি তোড়জোড় চলতে আছে কানে আইল। তা এমুন অবস্থায় আপনেরে সে দেখলে...

হ্যাঁ সেটা একটা সমস্যা বটে। তবে শুনলাম আমাদের বাড়িতে যারা আগুন লাগিয়ে দখল দিয়েছিল যাকে সে একজন অবাঙালি মুসলমান। তার কাছ থেকে আবার দুবার হাত বদল হয়েছে। এখন একজন বাঙালি মুসলমান ভদ্রলোক আছেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারেরই একজন পদস্থ অফিসার।

তয় তো হইয়া গেল। যদিও আমার ধারণা এইসব বুয়া ব্যাপার। স্বাধীনতার যাইট বচ্ছর পর অহনে আর ওই সব সম্পত্তি ফেরত দেওনে ঝামেলা আছে বিস্তর। কোনো সরকারই সেই ঝামেলায় যাইব না। গেলে তাগো গদিই টলমল...নাকি কন দাদা?

কী জানি, ব্যাপারটা তো ঠিক জানি না আমি। তাছাড়া যা গেছে তা নিয়ে আর দুঃখ করে লাভ কী, বরং যা আছে তাকে নিয়ে বেঁচে থাকাটাই এখন জরুরি—

ঠিক, ঠিকই কইছেন দাদা। নগেন যেন সামান্য উত্তেজিতই হয়ে পড়ে, তয় তাই বইল্যা নতুন কইরা আবার উচ্ছেদ...এইয়া নি ভালো লাগে কার!

নগেন বলে, একটু চা খান দাদা—

আবার চা খাওয়াবেন?

ক্যান, খান একটু। ব্যাগগুলি দ্যান আমারে। দোকানে রাখি। তারপর একটু চা খান।

কিন্তু যেতে দেরি হয়ে যাবে না?

আহা, আইজই তো আর কইলকাতায় ফিরবেন না। কইছিলেন না যাওনের দিন... বালুরঘাটে আপনের এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকবেন!

হ্যাঁ, আপনার মনে আছে ঠিক দেখছি—

তা মনে থাকব না। বালুরঘাটে কুনহানে যাইবেন দাদা?

চক ভবানী। নদীর পাড়েই। আত্রেয়ী নদী—

হ হ বুঝছি। আপনেরা বসেন তো। অখনও অনেক সোময় আছে। বালুরঘাট পৌঁছাইতে আর কতক্ষণ লাগব? বসেন একটু—

বলেই কাকে ডেকে চায়ের অর্ডার দেয় নগেন। আর সেই সময়েই এক যুবক এসে দাঁড়ায় দোকানের সামনে। যুবকের গলায় উত্তেজনা।

নগেনদা, শুনছ তো?

কীরে! কী শুনুম রে—

যুবক এপাশে ওপাশে তাকায়। এরপর বলে নীচু গলায়, গত পরশু যে লোকটা ঢুকছে বর্ডার পার হইয়া সে নিকি তোমাগো পাড়ায়ই লুকাইয়া আছে—

কে কইল তোরে?

শুনলাম। বিএসএফের কাছে খবর গেছে। এখ্‌খুনি বিএসএফ সার্চ করব তোমাগো পাড়ায়। ঘরে ঘরে।

কস কী তপন?

ঠিকই কই। তুমি যাও গিয়া দোকান বন্ধ কইরা। তুমি না গেলে বাড়ি বাড়ি ঢুইক্যা অত্যাচার শুরু করব বিএসএফ। তুমি থাকলে তবু ঝামেলা কম—

এই রে, দেহ কান্ড। নগেন অস্থির।

কী হইছে? যুবক তাকায় শরণদের দিকে।

নগেন জানায়, শরণদের কথা। সবে এল। একটু কথাটথা বলে চা আনার জন্য সবে বলেছে এখন যদি এদের ফেলে চলে যায়!

শরণের কানে গিয়েছিল। যেতেই সে কিছু একটা অনুমান করে নগেনকে চলে যেতে বলে। কিন্তু নগেন তবুও যায় না। তবে চা এলে চা খাবার পরে আর দেরি করে না। তপনকে বলে শরণদের নিয়ে বালুরঘাটের বাসে তুলে দিতে। বলেই শরণের দিকে তাকায়, আপনেরে চিঠি দিমু দাদা। ফোনও করুম—

খুব খুশি হব তাহলে।

নগেন জানায়, আসলে কী করুম কন। শুনলেন তো সবই। বর্ডার অঞ্চলে থাকার এই এক সমস্যা। এই দেহেন না আবার কী সমস্যা জুটল—

নানা আপনি এখ্‌খুনি চলে যান—

হ যাই। বলতে বলতে দোকান বন্ধ করে চাবি লাগায় নগেন। এরপর তার সাইকেলটা টেনে নিয়েই বেরিয়ে যায়। বেরোবার মুখেই বলে, আহি দাদা। চিঠি দিমু—

শরণ মাথা নেড়েই কাঁধে ব্যাগ তোলে। সঙ্গী মিহিরও কাঁধে ব্যাগ নেয়। পরে তপনের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই এগোয়।

শরণ কী ভেবে একবার পেছনে তাকায়। আর তাকাতেই চোখে পড়ে, থমথমে বর্ডারের ওপরে যেন একটা কুয়াশার রেখা। ধোঁয়ার মতো জমাট বেঁধে আস্তে আস্তে তা যেন নেমে আসছে বর্ডারেরই ওপরে।

চোদ্দো

রোদ পড়ে যাচ্ছিল আকাশ থেকে। বিকেলের প্রকৃতি আবারও রহস্যময়। উত্তরের দিগন্তে কোথায় যে এত কুয়াশা বাসা বেঁধে থাকে? চড়া রোদে উড়তে তাদের ভীষণই অপছন্দ। আকাশের গায়ে সেভাবে ডানা মেলা যায় না। খেত-খামার থেকে নদীনালা, ঝোপঝাড় আর বৃক্ষের পাতায় জড়াতেও সুখ নেই। কিন্তু রোদ পড়ল তো প্রবল ঠান্ডায় কনকনে হিমগুড়ি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা। তারপর ওড়ো কেবলই ওড়ো। উড়তে উড়তে ঝাঁপিয়ে পড় গা-গঞ্জ আর জনপদের বুকে। দখল নাও মাঠ-প্রান্তর আর বনজঙ্গল। ছড়িয়ে পড় নদীনালা আর জলাশয়ে। প্রকৃতি তখন রহস্যময়। অনন্ত প্রাণ যেন কোনও রুপোর কাঠির স্পর্শে তখন অজানা কোনো জগতে যাবার প্রতীক্ষায়।

জানলাটা টেনে দিয়ে বন্ধ করতে যাচ্ছিল এমনই সময় ঢুকলো পারুল। পারুলের চোখেমুখে অস্বস্তি। একটু যেন ভয়ও পেয়েছে সে।

কী অইল? রাশেদ ঘুরে দাঁড়ায় অবাক হয়ে।

পারুল এপাশে ওপাশে তাকিয়েই চাপা স্বরে জানায়, তোমার কথাখান জানাজানি হইয়া গেছে—

কেমনে অইল! রাশেদের মুখ নিমেষেই শুকিয়ে ওঠে।

সকালে তোমারে বাঁশবাগানে দেখছে আমার সই—

দ্যাখছ কান্ড! তইলে.... বিএসএফের কানে যাইতে তো দেরি অইব না অহনে.....

তা হইতে পারে—

পারে কী, অইবই....

তইলে! পারুল এবার অসহায়। বলেও ফেলে সঙ্গে সঙ্গে, কী করবা অহন?

কী আর করুম.... কুয়াশ লামব আর একটু পর থিকা। তুমি আমারে পিছ-দরজা খুইল্যা দিবা। বাঁশবাগান পার হইয়া আমি পালামু—

কোনদিকে যাইবা?

ক্যান, দুপৈরের দিকে জানলা ফাক কইর‍্যা দেখছি না পিছনটা... বাঁশবাগানের ভিতর দিয়া হেই জঙ্গুলের দিকে যামু গিয়া... হেয়ানে একখান বড় গাছ আছে—

গাছ আছে বুঝলাম, তুমি তো আর গাছে ওঠবা না....

উঠতেও পারি—

কী কও তুমি!

ঠিকই কই। উইঠ্যা না হয় বইয়্যা রইলাম হারারাত... পরে সকালে কুয়াশ কাটলে যাত্রা করুম বারসই—

ভয়ে ও অজানা আশঙ্কায় চুপ করেই ছিল পারুল, এমনই সময় হঠাৎ বাইরে কে যেন পারুলের নাম ধরে ডেকে উঠল। পারুল চমকে ওঠে। ভয়ও পায়। নিজের অজান্তেই মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে, কী অইল আবার! কারা ডাকে?

কিন্তু রাশেদ ততক্ষণে ঝট করে তার থলেটা টেনে নিয়েছে।

এক কাম কর। পিছ দরজার খিলটা না হয় খুইল্যা দিয়া যাও—

পারুল মাথা নাড়ে, না কুয়াশ লাগে নাই অহনও। ধরা পইড়্যা যাইবা—

কিন্তু—

খাড়াও না কে আইছে দেইখ্যা আহি। অহন বাইর হইলে তোমারও বিপদ... আমগোও—

পারুল সরে যায়। দরজা খুলে বেরিয়ে ডানদিক থেকে এগিয়ে সে নিত্যপদর ঘরে ঢোকে প্রথম। নিত্যপদ তখন জেগেই ছিল। পারুলের পায়ের শব্দেই জিজ্ঞেস করল, কে ডাকে অ বউ?

দেহি গিয়া—। এই তো গেল নিত্য জেঠার পোলার বউ। সোয়েটার বুনন শিইখ্যা গেল... অহন আবার কে ডাকে—

দেখ দেখি—

পারুল এগিয়ে যায়। কিন্তু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই থমকে দাঁড়ায়। এ পাড়ারই দুই কিশোর। হাতে একজনের ব্যাট একটা। অন্যজন বল একটা নাচাচ্ছিল আঙুলের মাথায়।

কাকিমা... বিএসএফ ঢুকছে... বাড়ি বাড়ি সার্চ করতে শুরু করছে। বর্ডার থিকা পলাইয়া আইয়া কে নাকি ঢুকছে কোন বাড়ি—

পারুল ভেতরে ভেতরে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এই সময়েই কিশোর দুজনের একজন বলে ফেলে, হরদাদু তাই পাঠাইল আমগো...

ঠিক আছে। তরা যা—

কিশোর দুজন দৌড়য়। আর দৌড়তেই পারুলের মাথায় কী খেলে যায়। খেলতেই এক মুহূর্তও আর সময় নষ্ট করে না। পারুল কাঁপতে কাঁপতেই ঘরে ঢোকে। সীতা নিশ্চয়ই গিয়ে হর জেঠাকে সবই বলেছে।

বাবা—ঘরে ঢুকে পারুল নিত্যপদর সামনে দাঁড়ায়। এরপরেই ঝুপ করে

সামনে বসে পড়ে।

হ কও বউমা, কে ডাকল? নিত্যপদ চোখের পাতা পিটপিট করে।

পারুলের গলা কাঁপে। একটু ইতস্তত করেই সে বলে, আপনের পোলা ফিরছে বাবা—

ফিরছে! নিত্যপদ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কই...কই গেল হারামজাদা....তোমারে কইছিলাম না হেয় ফিরবই। কই, কই সে হারামজাদা—

নিত্যপদর গলা যেন দ্বিগুণ চড়ে হঠাৎই। উত্তেজনা ও আবেগে।

পারুল তাকে সামলায়, চুপ—চুপ যান বাবা। আস্তে কথা কন। পাড়ায় আবার বিএসএফ ঢুকছে। ঘরে ঘরে ঢুইক্যা নাকি বিচরাইতে আছে—

কে, কে ঢুকছে!

বিএসএফ।

কারে বিচরায় হেরা?

কে নিকি ঢুকছে বর্ডার পার হইয়া....আপনেরে কইছিলাম না—

হ হ মনে পড়ছে— নিত্যপদর গলায় কাশি আসে। কাশিটা সামলে নিয়েই সে জানায়, তা হেরা আইব আহুক.... স্বজন তো হেইপারের কেউ না আমার পোলা। তোমার সোয়ামী—

কিন্তু যা কাম করে আপনের পোলা, যে ব্যবসা চালায় তাতে আবার কী হয় কে জানে—

বুড়ো কী ভাবে। পরেই বলে, হেইয়া অবশ্য ঠিকই কইছ বউমা। হ্যাযে হিতে বিপরীত না হইয়া যায়! হেয় কই?

আমার ঘরে বইয়া আছে চুপচাপ—

ক্যান, চুপচাপ চোরের মতো বইয়া আছে ক্যান? নিত্যপদ অস্থির, একবার আইতে পারল না হেয় বাপের কাছে! দেইখ্যা যাইব না বাপেরে... কী সুখে হেয় হুইয়া আছে। নাকি আইতে লজ্জা হয়—

একটানা বলতে গিয়ে বেশ একটু অস্থিরই হয়ে পড়ল নিত্যপদ। কাশির বেগ আসে। পারুল তার ডানহাতটা তুলে কম্বলের ভেতরে নিয়ে বুকটা ডলে দিতে থাকে নিত্যপদর। সামান্য পরে একটু সুস্থ বোধ করলে শুধোয়, কই আছিল সে এতদিন। বচ্ছর ঘুইর‍্যা গেল অহনে না মনে পড়ল তোমারে? আমার কথা না হয় ছাইড়্যা দাও—

না বাবা, আপনের কথা ছাড়ন লাগে না। ঘরে বইয়া অহনে পোলা আপনের কান্‌তে আছে।

কান্দে নিহি? নিত্যপদ চুপ। তার কী মনে পড়ে যায় আচমকাই।

একবার নাম গান চলছে কার বাড়িতে। নিত্যপদকে এসে নিয়ে গেছে তারা। নিত্য অবশ্য একাই যায় এসব জায়গায়। কিন্তু ছেলে সেদিন মানল না। সকাল থেকেই ধরে বসল নিত্যপদকে সে তার সঙ্গে যাবে। তা যায় যাবে। আট-ন'বছরের বাচ্চা। ধরে বসেছে। তা নিত্য তাকে নিয়েই গেল।

গ্রীষ্মের সন্ধে। গোবর লেপা খটখটে উঠোন। অদূরে তুলসীমঞ্চ। তাতে 'ঝরা'। আর চারপাশ জুড়ে অসংখ্য মানুষ। নারীর সংখ্যাই বেশি। মাঝে একটা টুলে হ্যাজাক জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর নীচে বড়বড় কাসার রেকাবিতে লাল বাতাসা সাদা বাতাসা ফেনি বাতাসা। স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। এছাড়া রাখা হয়েছে প্রচুর সন্দেশ। থরে থরে সাজানো। গৃহকর্তাটির গলায় কণ্ঠির মালা। কপালে রসকলি। থলথলে শরীর। নিশ্চুপ বসে নিত্যরই প্রতীক্ষায়।

তা নিত্য পৌঁছুল। সঙ্গে ছেলে। তা বাপ-ছেলে হাতমুখ ধুয়ে বসেছে ততক্ষণে। নিত্য ছেলেকে বসিয়েছে তারই পাশে। কিন্তু বলে দিয়েছে ছেলেকে। সাবধান করে দিয়েছে, সজু যেন নামগানের সময়ে না-ডাকে তাকে। ভালো না লাগলেও যেন চুপ করে থাকে। কেননা আজ নিত্যপদ কেবল নামগানই করবে না। আজ সে কথকঠাকুর। বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়ে আজ চৈতন্য বেরিয়ে যাবেন বৃহত্তরের আহ্বানে। সংসার ছাড়বেন তিনি। তা সে অধ্যায়টি যেমন গল্পচ্ছলে বর্ণনা করবেন তিনি তেমনি তার কণ্ঠে শোনা যাবে গান। ব্যাটারি লাগিয়ে তাই মাইকের ব্যবস্থা করেছে গৃহকর্তা। সেই সঙ্গে প্রচার। কত কত যে লোক এসেছে নানান পাড়া ঝেঁটিয়ে।

তা নিত্যপদ স্মরণ নিল তাঁকে। বন্দনা করল তাঁর। তারপর প্রবেশ তার চৈতন্য লীলায়। প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর আবেগে।

ভরাট গলা ছিল নিত্যপদর। সে গলায়ই বর্ণনা করতে করতে গান গেয়ে উঠছিল নিত্যপদ। কী সে গানের আবেদন। কী যে সে পদের আর্তি। শুনতে শুনতে শোক-সাগরে আচ্ছন্ন গোটা উঠোন। শ্রোতাদের গলা রুদ্ধ। চোখে জল। কাপড় তুলে মুছছিল সে নোনা অশ্রু। নিত্যপদ তারই মাঝে বুঝি গাইতে যাচ্ছিল কোনো পদ। কিন্তু ছেলে হঠাৎই পাশ থেকে ভেঙে পড়ল কান্নায়: নানা, আর গাইয়ো না... গাইয়ো না আর.... আমি আর পারতে আছি না—তুমি আর এমুন কইর‍্যা গাইয়ো না বাবা—

বলতে বলতে বলে উঠেই মূর্ছা গেল স্বজন। আর জ্ঞান হারাতেই দু'চারজন এসে তুলে নিয়ে গেল তাকে আসর থেকে। পরে তার চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়েছিল। কিন্তু নিত্যপদর তাতে কোনো হেলদোল নেই। সে ততক্ষণে সেই মুহূর্তে। যখন চৈতন্য ফেলে যাচ্ছেন তার সংসারের আঙিনা।

পরে আসর শেষ হতে যখন বাড়ি ফিরে আসছে তখন প্রায় মধ্যরাত,

সেই সময়ে নিত্যই বলেছিল, কী অইল রে, কইলাম না আমার গানের মাঝে কথা কইবি না?

কিশোর ছেলের ভাব তখনও যায়নি। বলেওছিল আস্তে আস্তে, কী করুম কও বুকখান য্যান ফাইট্যা যাইতে আছিল কষ্টে—

তাই নিকি?

হ বাবা। বড়ো কষ্ট—

অহনই কী—হাঁটতে হাঁটতে নিত্যপদ বুঝিয়েছিল, সংসারে তো প্রবেশ কর নাই অহনও... যিদিন করবা সিদিন থিকাই বুঝবা আসল কষ্টটা কোনহানে! তহন যদি কান্দো তয় বুঝুল তোমার মন আছে একখান...

তা সেই কান্নাই কি কাঁদছে এখন স্বজন!

নিত্যপদ হাত বাড়ায় একটা কম্বলের ফাঁক থেকে। হাতড়ে হাতড়ে পরে পারুলের হাত একটা ধরে ফেলে, তা কান্দে ক্যান! ক্যান কান্দে অহন—অ বউ—

পারুল চুপ। আবার ভয়ও হয় তার। মুহূর্তের আবেগে সে এ কী করে বসল? শেষে আবার শ্বশুরের কাছেই না সে ধরা পড়ে যায়! ধরা পড়লে...

পারুল আর ভাবতে পারে না। সে কেন কথাটা বলে ফেলল! কেনই বা জানাল নিত্যপদকে যে তার ছেলে ফিরে এসেছে। একটা মিথ্যে যে আরও অনেক মিথ্যে তৈরি করে তা কি আর এখনও জানে না পারুল? তার চেয়ে পেছনের খিলটা খুলে দিলে পেছনের দরজা দিয়েই পালিয়ে যেতে পারত লোকটা। আপদ বিদায় হত। কিন্তু তবুও সে কেন সেই সুযোগটা নিল না! কেন ব্যাপারটাকে মুহূর্তেই এমন জটিল করে তুলল? তবে কি রাশেদকে বাঁচাতে চেয়েছে সে? নাকি রাশেদের মধ্যে স্বজনকে দেখার একটা প্রবল বাসনাই তাকে উসকে দিয়েছিল এমন একটি জটিল আবর্ত সৃষ্টি করতে?

নিত্যপদ শুধোল, কই... একবার আইব না সে এইহানে! দেইখ্যা যাইব না বাপেরে? কেমুন আছে তার বাপে—

শুকনো গলায় ইতস্তত করেও পারুল জানায়, হ আইব তো... তয় হেয় আহনের সঙ্গে সঙ্গেই বিএসএফ পাড়ায় ঢোকায় ডরাইতে আছে।

ক্যান, ডরের কাম কী?

ডরায় যদি কুনো ছুতায় হেরে ধইর‍্যা লয়—

ক্যান, বিনা ছুতায় ধরব ক্যান! নিত্যপদ হাতটা ছাড়িয়ে নেয় পারুলের হাত থেকে। পরে বলে, অরে আইতে ক তো—ক আইতে এইহানে। আইয়া বহুক আমার সামুনে...দেহি বিএসএফ কেমুন ধরে... যা বউ অরে আইতে ক। নইলে ল আমিই যাই—

নিত্যপদ হাতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে।

পারুল আঁতকে ওঠে, নানা—এইয়া কী করেন... আপনি নি পারেন যাইতে—

নিত্যপদ হতাশ, তয় অরে আইতে ক—

পারুল ওঠে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার উঠে দাঁড়ায়। যেতে গিয়েও এরপর বলে, তয় আইলে আর পুরানো কথা লইয়া কিছু কইতে যাইয়েন না। আপনের শরীল খারাপ হইব।

না না, আমি কী কমু.... আমি কওনের কে! সবই প্রভুর ইচ্ছা... তার ইচ্ছাতেই তো জগত-সংসার চলে এমুন—

পারুল বেরিয়ে আসে। একবার রাশেদের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। কী ভেবে আবার সেদিকে না গিয়ে বারান্দায় আসে। কিন্তু আসতেই কিছু কথাবার্তা। কিছু গুঞ্জন। পারুলের কী মনে হয়। আর মনে হতেই সে একবার নীচে নামে। কিন্তু নামতেই চমকে ওঠে। বাইরে পড়ন্ত রোদের আলোয় অদূরে একটা জটলা। জটলারই ভেতরে দু তিনজন জওয়ান। হাতে রাইফেল।

পারুল চমকে ওঠে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার ভেতরে। ঘরের ভেতরে ঢুকেই দরজার পাল্লাটা ভেজিয়ে দিয়েই নিত্যপদর মাথার সামনে বসে পড়ে।

বাবা—

কে বউমা। কই, আইছে? কই রে আইলি, আয় খোকা...আইয়া বয় দেহি এইহানে—

পারুল ছটফট করে। করতে করতেই নিত্যপদর কানের কাছাকাছি মুখটা নিয়ে যায়, চুপ। একারে চুপ কইর‍্যা থাকেন বাবা। বিএসএফ জওয়ানরা ঢুইক্যা পড়ছে আমগো পাশের বাড়িতে—

কাগো... নিরঞ্জইনা গো বাড়িত নাকি?

হ—। অহনে কী করা যায় কন তো... আমি তো আপনের পোলারে ডাইক্যা আনতে গিয়া দেহি এই ঘটনা—

নিত্যপদ চঞ্চল।

এক কাম কর বউমা। অরে নিয়া আহো। ডর নাই... কী করব দেহি না বিএসএফ। পাড়ার লোক আছে পিছে পিছে। তারা দেইখ্যাও তো কইব—হেয় কে? যাও বউমা— খোকারে কও আইতে। ঠাকুর আছে ডর নাই—

পারুল এখন উভয় সংকটে। একদিকে না আনলেও নয় অন্যদিকে আনলেও আবার ধরা পড়ে যাবে। পারুলের বুক শুকিয়ে যায়। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে আরও।

না হয় আর এক কাম করতে পারো—

নিত্য বলে কাঁপা গলায়।

পারুল বেরিয়ে যাচ্ছিল। নিত্যপদর কথায় থমকে দাঁড়াল। তখন নিত্যপদই জানাল, হেয় আসুক... আইয়া আমার কম্বলের ভিতর হুইয়া থাকুক... কাথা-কম্বল-কোল বালিশের মইধ্যে হুইয়া থাকলে জওয়ানগুলি বুঝতে পারব না—

পারুল একটু হাঁপ ফেলে। এতে অবশ্য পাড়ার লোক রাশেদকে দেখতে পাবে না। পরে ঘরদোর সার্চ করে বিএসএফ বেরিয়ে গেলে রাতের অন্ধকারেই না হয় রাশেদ বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু বিএসএফ যদি কম্বল তুলে দেখে?

পারুল ভয় পাচ্ছিল। একসময় আবার বলল নিত্যপদই, কই বউমা... যাও তাড়াতাড়ি—

পারুল এগোল আর এগোতে গিয়েই বলল, তয় আপনে কিন্তু কোনও কথা কইবেন না। পোলারে কিছু জিগাইবেনও না। বিএসএফ গেলে হেয়ার পর সব কথা—

হ হ। ঠিকই কইছো। আমি ঠোঁডে কুলুপ আইট্যা থাকুম—

পারুল দাঁড়ায় এক মুহূর্ত। নিত্যপদর বিছানাটা পরীক্ষা করে। তারপর এগোয়। এগিয়েই দ্রুত ছুটে গিয়ে পেছনের সেই খুপরিতে।

খুপরিতে রাশেদ তখনও গভীর এক উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়েছিল। ঘরের ভেতরের কথোপকথন অনেকটাই তার কানে এসেছে। তবুও যেন বোঝেনি কিছুই। পারুল এসে বলাতেই বুঝল। কিন্তু বুঝেও সে অবুঝ। কিছুতেই রাজি হয় না।

না না, এইয়া ঠিক না। এইয়া ঠিক না। বুইড়া মানুষ চউক্ষে দ্যাখে না...তারে আমি ধোকা দিই কেমনে? না না, তুমি আমারে পিছ দরজাটা খুইল্যা দাও—

রাশেদ থলে হাতে নিয়েই দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ করে পারুল হঠাৎই তার হাত থেকে থলেটা নিয়ে তক্তপোশে রেখে দিয়েই রাশেদের হাত দুটো ধরে ফেলে, অহন আর না-কইরো না। রাজি হইয়া যাও... আমারে বিপদে ফালাইও না—

রাশেদ চুপ প্রথমে। কী একটু ভাবে। এরপর পারুলের নির্দেশ মতোই তার পেছনে পেছনে ভয়ে ভয়ে এগোয়।

পনেরো

বারান্দার নীচেই দাঁড়িয়েছিল পারুল। পায়ে পায়ে বুটের শব্দ তুলে চারপাঁচজন জওয়ান এসে দাঁড়াল সামনে। পেছনে পেছনে গাঁয়েরই যত নেড়িগেড়ি। দু চারজন বয়স্ক মানুষজনও আছে। ওরই মধ্যে ময়নার দাদা

নগেনকেও চোখে পড়ল পারুলের।

জওয়ান কজনের একজন দশাসই। প্রায় ছ'ফুটের ওপরে লম্বা। পারুলের সামনে এসেই শুধোল, এই কোঠি তোমার!

হ। ঘাড় নেড়ে মাথা দোলাতেই জওয়ানটি আবারও জিজ্ঞেস করল, ঘরে কে কে আছে?

পারুল উত্তর দিতে যাচ্ছিল এই সময়েই এগিয়ে এল নগেন হালদার।

এনার ঘরে এনার এক অসুস্থ শ্বশুর ছাড়া আর কেউই নাই, সিপাইজী।

এনার হ্যাজবান্ড! সে কোথায়? নগেনের দিকে চোখ রাখতে রাখতে পারুলের দিকে আবার চোখ ফিরিয়ে এনেছিল জওয়ানটি। নগেনই জানাল, বাইরে চাকরি করে। মাঝেমইধ্যে আসে।

জওয়ান লোকটা একবার বারান্দার দিকে তাকায়। বলে এরপর, এই ঘরে ঢুকব একবার। সার্চ করব—

নগেন মাথা কাত করে, হ হ দ্যাখেন না—বউঠান অগো লইয়া যান...

পারুল বারান্দায় ওঠে।

আজ অবশ্য হাওয়া নেই। কিন্তু কনকনে ঠান্ডাটা আছে। ঠান্ডাটা আরও বাড়বে আরও খানিকটা বাদে কুয়াশার খেলা শুরু হলে।

জওয়ান লোকটা মাথা নীচু করে ভেতরে ঢুকেছিল। ঢুকে বারান্দা দেখল। বারান্দার আড়াল করা জায়াগাটায় ঢুকল। জায়গাটায় মাটি দিয়ে বানানো পুতুল থেকে রঙ করা কুলো-পিঁড়ি-সরা সাজানো ছিল। জওয়ানটি শুধোল, এগুলো কী আছে?

নগেন উঠে এসেছিল। সেই-ই বুঝিয়ে দিল। জানাল এইগুলি মাটির পুতুল গড়ার সরঞ্জাম। পুতুল থেকে কুলো-পিঁড়ি সবই রং করা হয় বিয়ের জন্য। লোকে আসে নানা জায়গা থেকে.... এসে পারুলকে অর্ডার দিয়ে যায়। পারুলও তাই ঘরে বসে বানায় এগুলো। শুনে জওয়ান কজন তখন ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে আবার।

পারুল পাল্লা ঠেলেই ভেতরে ঢুকেছিল। কিন্তু জওয়ানটি আর ঢুকল না। দরজার পাল্লা ধরে বুক পর্যন্ত ভেতরে ঢুকিয়েই শুধোল, এই বুঢ়া কে হচ্ছে তোমার?

নগেন পেছনেই ছিল। সে-ই জানাল, এই বুড়ো মানুষটির ছেলেই এর হ্যাজবান্ড।

পারুলের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছিল নগেন। এই সময়েই নিত্যপদর একটু কাশির বেগ এল। নিত্যপদ দু চারবার কেশে উঠল।

নগেন শুধোল, কেমুন আছেন নিত্যকাকা?

নিত্যপদ গলা চিনেছিল। জিজ্ঞেস করল, কে নগেন?

হ নিত্যকাকা—

ঘরে আহো।

অহনে আর আসুম না কাকা... অরা আইছে—

অরা কারা?

বিএসএফের জওয়ানরা। পরশু রাইতে আমগো পাড়ায় নাকি একজন ঢুকছে.... বর্ডার থিকা পলাইয়া আইয়া—

হ হ হুনছি। বউমায় আমারে কইছে—নিত্যপদ উশখুস করে, তা ধরা পড়ছে?

না কাকা। তয় অহনও নাকি আমগো এই পাড়ায়ই লুকাইয়া আছে—

কী কান্ড! কও দেহি—!

হ কাকা। নগেন জানায়, হেয় লাইগ্যাই বাড়ি বাড়ি সার্চ হইতে আছে—

নিত্যর চোখ পিটপিট করছিল। জওয়ান মানুষটি নগেনের দিকে তাকাতেই নগেন বলল, চউক্ষে দেখে না। ব্লাইন্ড আদমি। অন্ধা।

জওয়ান লোকটির চোখ তখন ঘরের ভেতরে। পেছনেরই দিকে। একবার তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, ওদিকে কী আছে?

ওদিকে আরও ঘর... পাকশালা—

পারুল উত্তর দিতেই লম্বা জওয়ানটিই বলল, একবার দেখব—

হ হ, দ্যাখেন না—

এবারেও পারুল। উত্তর একটা দিল। কিন্তু দিলেও চোখ ছিল তার শ্বশুরের বিছানার দিকে। শ্বশুর যেভাবে কথা বলছে তাতে কম্বলটা একটু সরে গেলেই বিপদ। তাছাড়া যেভাবে নিশ্বাস চেপে শ্বশুরের গায়ের সঙ্গে কম্বলের তলায় সেঁটে রয়েছে রাশেদ তাতে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা যে কোনো মুহূর্তেই। একটু নড়াচড়া কিংবা নিশ্বাসের একটু এদিক ওদিক হলেই ধরা পড়ে যেতে পারে। যদিও শ্বশুরকে সাবধান করে দিয়েছিল পারুল এবং বলা বাহুল্য রাশেদকেও, তবুও বিপদ ঘটতে কতক্ষণ!

জওয়ান লোকটি ঘরে ঢুকল। পরে পেছনের ঘর ও রান্নাঘর দেখে, রান্নাঘর থেকে বাইরে যাবার দরজাটা দেখিয়ে সেটা খুলতে বলেছিল। আর খুললেই বাকি জওয়ানদের নিয়ে সে ততক্ষণে বাইরে। বাঁশবাগানের দিকে। বাঁশবাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখল ওরা। পরে পুকুর। পুকুরের পাড়।

কিন্তু পুকুরের পাড় থেকে ফিরে আসতে গিয়ে হঠাৎই সঙ্গের এক জওয়ান লম্বা-জওয়ানটির কাছে এসে গলা নামিয়ে কী বলল। বলতেই লম্বা জওয়ানটির মুখ কঠিন। দ্রুত পায়ে সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুরে গিয়ে আবার পারুলের বারান্দার

সামনে। সামনে গিয়েই সরাসরি বারান্দায় উঠে যায়। উঠেই একবারে দরজার সামনে। হাতে ধরা তার উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রটি।

নগেনরা অবাক। সেই থেকেই আছে সে। বিকেলে খবর পেয়ে দোকান বন্ধ করে এসে পাড়ায় ঢুকতেই চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা। বিএসএফ জওয়ানরা ঢুকছে পাড়ায়। সবই খবর পেয়েছিল সে। তবু জিজ্ঞেস করতেই জানতে পেরেছিল। আর জানতেই থেকে গিয়েছিল দলের সঙ্গে। সাইকেলটা এক বাড়িতে ঢুকিয়েই বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে এরপর। ঘুরছিলও এতক্ষণ। ওরা বাড়ি বাড়ি ঢুকেছে। বাড়ির লোকজনদের নানান রকম প্রশ্ন করেছে। আবার দেখে টেকে বেরিয়েও এসেছে। আর তাতে যতটা সহযোগিতা করা যায় তাই করছিল নগেন। কিন্তু হঠাৎই পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে আচমকা এমন কী হল যে একবার সার্চ করে আবারও সার্চ করার জন্য ঢুকতে হবে পারুলদের বাড়িতে। তবে কি এ-বাড়িতেই লুকিয়ে আছে সে!

কা হুয়া সিপাইজী? নগেন এগিয়ে যায়।

ও বুড্ঢা গো বিস্তারা দেখনে হোগা—

দেখলেন তো একবার। নগেন বোঝাবার চেষ্টা করে, আবার কী হইল?

হোয়েছে হোয়েছে। লম্বা জওয়ানটি ঘাড় ঝাঁকায়, ও বুড্ঢার সঙ্গে কে শুয়ে আছে—

শুইয়া আছে! কে আবার শুইয়া থাকব সিপাইজী....নগেনও বারান্দায় উঠে, চলেন তো—

বলে নিজেও সে ভেতরে ঢুকে পড়ে। পারুলের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে যায়। জওয়ান কজন পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতেই পেছনের দরজাটা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে সে এগিয়ে আসছিল আবার সামনের দিকে। আচমকা লম্বা জওয়ানটিকে ফের ঢুকতে দেখেই চমকে ওঠে। বুঝতে পারে গোলমাল কোথাও একটা হয়ে গেছে। হয়তো শ্বশুরের বিছানাটা দেখেই সন্দেহ হয়েছে।

এ মাঈ, এ বিস্তারা দেখনে হোগা?

জওয়ান লোকটির সঙ্গে সঙ্গে পেছনে নগেনও ছিল। নগেনের পেছনে বাকি জওয়ানেরা ও তাদের পেছনে গাঁয়ের আরও কজন। একবার দেখে বেরিয়ে আবারও বিএসএফকে ঢুকতে দেখে জটলার ভেতরে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল। ফলে ভিড় বেড়ে গিয়েছিল বারান্দায়।

নগেন বলল পারুলের দিকে তাকিয়ে, একবার নিত্যকাকার গায়ের কম্বলটা তুইল্যা দেখান তো বউঠান—

গায়ের কম্বল?

হ। হেগো সন্দেহ হইছে নিত্যকাকার কম্বলের তলায় কেউ হুইয়া আছে। আর হেইটা নিত্য কাকায়ও জানে। না জানলে লোকটা কম্বলের ভেতরে ঢোকে কী করে।

পারুলের বুকের ভেতরটা হিম। পা দুটোয় যেন খিল লেগে যায়। তবুও শেষবারের মতো সামলাবার চেষ্টায় মরিয়া হয়েই বলে ওঠে, কিন্তু উটকা একটা বাইরের লোক, তারে নি হউর নিজের পাশে হোইয়াব—

হেইয়া তো ঠিকই কথা! তয় দেখতে যহন চাইছে....

বলতে বলতেই ঝুঁকে পড়ে নগেন হালদার, ও কাকা আপনের লগে নিকি কে হুইয়া আছে?

নিত্যপদ চোখ বুজেই পড়েছিল। বিএসএফ যে আবার ঢুকেছে এবং ঢুকে যে সন্দেহ হওয়ায় তার বিছানাটাও দেখতে চাইছে সেও শুনেছিল। এবং শুনেই সে আড়ষ্ট হয়ে যায়। ভয়ে তার বুকও কেঁপে ওঠে। টের পায় জওয়ানদের নিশ্চয়ই সন্দেহ হয়েছে। আর সন্দেহ হওয়ায় ফের ফিরে এসেছে। ফলে এবারে সে ধরা পড়ে যাবে। আর ধরা পড়লে কী যে করবে আর কী বলবে নিত্যপদ তাও ভাবতে পারছিল না। না পেরে চোখ বুজে কাঠ হয়েই পড়েছিল। ভাবছিলও আবার, তবে কি ছেলে কোনো গোলমাল করে ফিরল? কোনো চোরা-চালানের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে কি! কী জানি হয়তো পড়েছে। আর খবর পেয়েই তাই জওয়ানরা ঢুকে পড়েছে। একবার দেখে গেছে। সন্দেহ হওয়ায় আবারও এসেছে। তবে আসুক। সে তার ছেলে। অনুপ্রবেশকারী তো নয়। যদি কম্বল তুলে দেখে তো দেখবে। ইস যদি বুঝত তবে হাত বাড়িয়ে ইশারায় তাকে সরে যেতে বলত! ভাবছিল নিত্যপদ। এই সময়েই নগেন ডাকে।

নিত্যকাকা—

চোখ খোলে নিত্যপদ। এরপর সাবধানেই গলা তোলে, কে নগেন! আবার কী অইল? ভয়ে ভয়েই বলে নিত্যপদ, পাওয়া গেছে নিকি লোকটারে?

নগেন নিত্যপদর গায়ের কম্বলটা ভালো করে লক্ষ করছিল। সঙ্গে সঙ্গেই এবারে সে বলে ওঠে, হ পাওয়া নিকি গেছে। আর হেয় নিকি আপনের বিছানায়ই....

না না, কী কও—কথাটা শেষও হল না নগেনের নিত্যপদ হঠাৎই হাউ মাউ করে ওঠে, ও নগেন... কও কী আমার যে হাত-পাও কাঁপতে আছে—

আরও কী বলতে যাচ্ছিল নিত্যপদ কিন্তু বলতে আর দিল না লম্বা জওয়ানটি। আগ্নেয়াস্ত্রটি বুড়োর বিছানার দিকে নিশানা করেই অন্য একজন জওয়ানকে নির্দেশ দিল, হেই ওঠা লেও ব্ল্যানকেট... ঠিকসে উঠানে হোগা—

জওয়ানটি এগিয়ে যায়। লম্বা জওয়ানটির পাশাপাশি আরও দুজন জওয়ানের

হাতে তখন উদ্যত দুই রাইফেল। বিছানার দিকে তাক করা।

কিন্তু কম্বলটা তুলে নেবার আগে হঠাৎই পারুলের গলা ছিটকে আসে, খাড়াও।

জওয়ানটি থমকে যায়।

পারুল এগিয়ে আসে, আমি তুইল্যা লইতে আছি কম্বলটা—

না না। এ মাঈ—লম্বা জওয়ানটি চেঁচিয়ে ওঠে, বহোত খতরনাক আদমি। হাতে রিভলবার থাকলে গোলি চালাতে পারে। তুম মত যানা—

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ক্ষোভে-রাগে ও অভিমানে পারুল বুঝি দগ্ধ হচ্ছিল ততক্ষণে। আচমকা দৌড়ে এসেই সে কম্বলটা তুলে ধরে। আর ধরতেই চমকে ওঠে। কোথায় রাশেদ?

লম্বা জওয়ানটির হাতের অস্ত্রটি আপনা থেকেই নেমে যায়। আর যেতেই সে চোখ ফেরায় পাশের জওয়ানটির দিকে, কা হুয়া... কা দেখা তুম—

অন্য জওয়ানটির মুখ চুন। তবুও সন্দেহ বুঝি যায় না। কিন্তু কিছু বলার আগেই লম্বা জওয়ানটি বেরিয়ে যায়। আর বেরোতেই নিত্যপদর চিৎকার, কী হইল.... অ নগেন—কী অইল!

কিন্তু যার উদ্দেশ্যে বলা সেও ততক্ষণে বিএসএফের পেছনে পেছনে। মুহূর্তেই ঘরটা ফাঁকা। একে একে প্রায় সবাইই বেরিয়ে যায়। কিন্তু বেরোলেও নড়তে পারে না পারুল। পা দুটো যেন তার সত্যিই আটকে গেছে ঘরের মেঝের সঙ্গে। মানুষটা গেল কোথায়? অত বড় জলজ্যান্ত একটা দেহ?

নিত্যপদ বোধহয় টের পেয়েছিল সবাই চলে গেছে। আর টের পেতেই সে একসময় চঞ্চল হয়ে উঠল। হাতড়ে হাতড়ে চারপাশে কী দেখতে দেখতেই ডাকল, বউ—

পারুল তখনও স্থির। কম্বলটা হাতে নিয়েই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল। নিত্যপদর কথায় খেয়াল হল। চটপট শ্বশুরের গায়ে আবার কম্বলটা চাপিয়েই বলে উঠল, কন... কী কইতে আছেন?

নিত্যপদ চোখ ঘোরায় চারদিকে, বেবাকে চইল্যা গেল?

হ। হগলেই গেছে—

নিত্যপদ জিজ্ঞেস করে, কিন্তু হেয়......হেয় কই? কখন উইঠ্যা গেল... ট্যার পাইলাম না তো? তয় উইঠ্যা য্যান ভালোই করছে। নইলে ধরা পইড়্যা যাইত। কিন্তু গেল কই?

কোথায় গেল এ- প্রশ্ন পারুলেরও। পারুল তাই জানায়, কী জানি... দেহি আমার ঘরে—

হ হ, দেহ তো। আমার লগে তো কথাই হইল না—

পারুল ওঠে তৎপর পায়ে। তারপর দ্রুত পায়েই পেছনের খুপরিতে।
যা ভেবেছিল। রাশেদ বসে আছে সেখানে। তক্তাপোশের ওপরে। কিন্তু চোখেমুখে সংকোচ। যেন ভয়ংকর কিছু একটা অন্যায় করে বসেছে সে। পারুল যেতেই তাই তক্তাপোশ থেকে নামল।

ছি ছি ছি। এইয়া কী অইল?

কী অইল? পারুলের বুকের ভার নেমে গিয়েছিল রাশেদকে দেখে। কিন্তু বিস্ময় তখনও কাটেনি। মনের মধ্যে প্রশ্নটা তাই ঘুরে ফিরেই আসছিল বারে বারে। সে কি করে উঠে এল এত লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে। আর এমনই সময় উঠে এল যে আর একটু হলেই হয়েছিল আর কী! রাশেদ কি তাহলে কিছু টের পেয়েছিল?

জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল তার আগেই রাশেদের চাপা গলা, তোমার হউরের কাছে গিয়া গাও সাটাইয়া হোওন কি আমার ঠিক অইছে?

ক্যান!

ক্যান কী... হেয় যে নামগান করে... আমি গিয়া কম্বলের ভিতরে ঢোকন মাত্রই তোমার হউরের গলায় শুনি গুনগুনাইয়া নামগান.... তোমরা কি বৈষ্ণব নিকি?

হ, ক্যান!

ছি ছি ছি। আমি তারে...

কথা না শেষ করতে দিয়েই পারুল বলল, ক্যান তোমার গায়ে কি পাক লাইগ্যা আছে? হউরের গায়ে কি হেই পাক লাগল নিকি? হেইয়া ছাড়া হউরই তো কইল তোমারে তার কম্বলের ভিতরে নিয়া লুকাইয়া রাখতে?

রাশেদ মাথা নাড়ে, হ হেইয়া তো ঠিকই। তয় হেয় তো জানে আমি তার পোলা। কিন্তু যহনে জানব....

এ-কথার কোনো উত্তর নেই। ফলে পারুল যেন বলতেও পারল না কিছু। কিন্তু পারুল না বললেও রাশেদই বলে আবার, যাউক গিয়া বৈকাল পড়ছে। অহনি শুরু অইয়া যাইব কুয়াশার দাড়িবান্দা খেলা। আমারে তুমি পিছ দরজাটা খুইল্যা দিও। আমি যামু গিয়া—

যাইবা? পারুলের গলা বসে যায়।

হ, অহন তো যাইতেই অয়—

হ। তা তো যাইতেই হয়। এইহানে তুমি পইড়া থাকবাই-বা ক্যান!

থাকন তো উচিতও না। কও তুমি—

পারুল চুপ। সামান্য পরেই আবার বলে,

কিন্তু কই যাইবা! পারুলের গলার স্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসে।

রাশেদ হাসে, কইছি তো তোমারে। যামু হেই বারসই। আর যদি না যাইতে পারি... তয় তো আবার ধরা পইড়্যা ফির‍্যা যামু। ধইর‍্যা নিয়া ঢুকাইয়া দিব আবার কাঁটাতারের বেড়া তুইল্যা... হ্যাযে ধরা পইড়্যা আবারও হয়তো একদিন ইন্ডিয়ায় ঢুকাইয়া দিব.... বান্দার জীবন আমার... এমুন কইর‍্যাই বুঝি চলব....

পারুল চুপ। গলা যেন মুহূর্তেই বসে যায় তার। তাই কোনো শব্দও নেই।

রাশেদ বলতে থাকে, তয় তোমারে আমার মনে থাকব... মনে রাখুম আমি... আমার লাখান এউগা রাস্তার পোলার লাইগ্যা তুমি যা করছ....

কেন কী জানি পারুলের গলাটা চিড় খেয়ে যায়। চোখ ভিজে ওঠে জলে। নিজেকে তবু সামলে নেয় পারুল। অনেক কষ্টে বুকের কান্না সামলে সে জানায়, তুমি বহ অহন তইলে... কুয়াশা লামুক—

বলতে বলতে পারুল ফেরে, যাই একবার হউরকে দেখি গিয়া। যে মিথ্যা একবার কইছি হেই মিথ্যারে সত্য করনের লাইগ্যা না-জানি আরও কত মিথ্যা সাজাইতে হয়—

কিন্তু হউরকে তুমি ওইডা কইতে গেলা ক্যান? ক্যান কইলা পোলা আপনের ফির‍্যা আইছে—

ক্যান যে কইলাম! পারুল বিড়বিড় করে। বিড়বিড় করতে করতেই একসময় সে স্থির। নিজের ঘরে গিয়েই অন্যমনস্ক হয়ে বসে পড়ে।

ষোলো

বিছানায় শুয়ে তখনও পারুলকে ডেকে যাচ্ছিল নিত্যপদ। কিন্তু পারুল শুনেও শুনছিল না। কিন্তু নিত্যপদর তাতেও যেন ক্ষান্তি নেই। মাঝে মাঝে পারুলকে ডাকছে। ছেলের কথা জিজ্ঞেস করছে। জিজ্ঞেস করতে করতেই একসময় আবার আত্মবিলাপ।

আমার কপালডাই ফাডা.... দ্যাশ গেল ভিডা গেল.... হ্যাযে পোলাটাও... নিত্যপদর চোখে জল নাকে জল। পারুল দেখেও যেন দেখে না। কী আর দেখবে! দেখতে দেখতেই তো এই এতদূর চলে এল সে।

সেই কবে, উনিশে পা দিয়েই এ বাড়িতে এসেছে সে। নববধূটি হয়ে। সংসারে শুধু দুই প্রাণী। এক প্রবীণ ও নবীন। প্রবীণের গলায় কণ্ঠির মালা, কপালে রসকলি। ছোটোখাটো একটা দোকান আছে। সারাদিনই গুণগুণ করে নামগান করতে করতেই দোকান চালায়। ছেলেও টুকিটাকি কীসব ব্যবসাপাতি করে। সংসারে আয় থাকলেও টানাটানি কমে না। এদিক টানলে ওদিক বেরোয়। তবু সে সংসারে পা দিয়ে সংসারটাকে নিজের করে নিল। আর নেবে নাই বা কেন! উনিশের যুবতীর চোখে যে তখন দুরন্ত স্বপ্ন। স্বপ্ন আর

আবেগের ঢেউ। প্রবীণটি তাকে স্নেহ করবে নবীনটি তাকে ভালোবাসবে এই তো চেয়েছিল সে।

ভালোবাসবে। তার সঙ্গে কথা বলবে। তাকে বসিয়ে গল্প শোনাবে। আবলতাবল কতই না গল্প। যা খুশি হোক। কথা বলবে মানুষটি আর হাঁ হয়ে শুনবে পারুল। আবার পারুল বললে সে বুঝি মুগ্ধ। পারুলের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকবে। আর থাকতে থাকতেই চোখ কখন সলজ্জে বুজে আসবে পারুলর। তখন সে চোখের ওপরই আচমকা এক স্নিগ্ধ চুম্বন। চুম্বনটি বন্যা হয়ে উঠবে এরপরেই। তখন পারুল যে কোথায় হারিয়ে যাবে।

হারিয়েই যাচ্ছিল পারুল। নিত্যপদর গলা যেন হঠাৎই কান্নায় ভেঙে পড়ল। আর পড়তেই ছুটে যায় পারুল।

কী অইল কান্দেন ক্যান অমন কইর‍্যা—

নিত্যপদ চুপ। পারুল এসে দাঁড়ালেও অনেকক্ষণ আর কোনো কথা বলে না। শেষে একটু সামলে নিয়েই জিজ্ঞেস করে, হেয় চইল্যা গেল— না?

পারুলের বুক কেঁপে ওঠে। এবারেই তো সেই মিথ্যেটা সাজিয়ে নতুন আর একটা মিথ্যে তৈরি করতে হবে। নতুন আর একটি সত্যির জন্য।

ইতস্তত করেও পারুল জানায়, হ ক্যান যে আইছিল আর ক্যান যে গেল—

নিত্যপদ চুপ করেই শুনল। পরে আবার শুধোল, তর লগেও কথা কইল না?

নিত্যপদর স্বভাবই এই। পারুলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অতিরিক্ত স্নেহে কখনো কখনো তা 'তুমি' থেকে 'তুই'-এও নেমে যায়। পারুল জানে, ওই তখনই শ্বশুর বড় অসহায় হয়ে পড়ে। পারুলের প্রতি সে যে সুবিচার করেনি তাও যেন তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নিত্য মাথা নাড়ে, কী করুম ক... হেয় তর মর্যাদা বুঝল না... আমারই ভুল.... ভুলডা আমারই.... আমি বুঝতে পারি নাই.... বান্দরের গলায় মুক্তার মালা তুইল্যা দিছি—

আহ্ বাবা, আপনে একটু শান্ত হন তো। সবে কাশটা একটু কমছে—

বলতে বলতেই পারুল বসে পড়ে তার শিয়রে, এমুন করলে শরীল খারাপ অইয়া যাইব—

আর শরীল! শরীল দিয়া করুম কী? মনই যার গেছে মইর‍্যা তার আর এই শরীলের কাঠামোখান লইয়া কী অইব... অহনে যাইতে পারলে হয়—

বাবা! পারুলের গলায় মৃদু ধমক। মাথায় হাত বুলিয়েও দিতে থাকে। চুলের ভেতরে আঙুল চালাতে চালাতেই বলল, আপনেই না আমারে কইছিলেন ধৈর্য্য ধরতে অইব.... তয় অহনে আপনে ভাঙেন ক্যান?

নিত্যপদ কম্বলের ভেতর থেকে হাত একটা বের করে। পরে চোখ একটু রগড়ে নিয়েই শূন্য দৃষ্টিতে তাকায়।

লাঠি পুরান অইলে ভিতরে ভিতরে নরম অইতে থাকে। শক্ত মনে অইলেও তারে আর তহন শক্ত কওন যায় না।

পারুল কী বোঝে কী বোঝে না। এই সময়েই নিত্যর গলায় শ্লেষ্মা জড়িয়ে যায়। কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়েই নিত্য শুধোয়, বেলা পইড়্যা গেছে না?

হ।

কুয়াশ লাগছে?

লাগে নাই অহন তরি... তয় লাগব—

নিত্যপদ কী ভাবে। পরে বলে, কাইল একবার হরমাস্টাররে আইতে কইস তো?

কমু। পারুল উত্তরটা দেয় কিন্তু দিতে গিয়েই চমকে ওঠে। একসময় বালিশের পাশ থেকে একটা পাতলা উলের টুপি মাথায় পরিয়ে দেয় নিত্যপদর। তারপর উঠে দাড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, আপনের লেইগ্যা দুধ লইয়া আহি বাবা। গরম খাইলে ভালো লাগব—

বলেই পা বাড়িয়েছিল। এই সময়েই নিত্য যেন আবার কী বলে ওঠে, বউমা—

পারুল থমকে দাঁড়ায়।

একটু থেমে নিত্য বলে, একখান কথা কই—

পারুল তাকিয়েছিল অবাক হয়ে। নিত্যপদ বলল থেমে থেমে, ভুল কইর‍্যা আবার আইলেও তুমি হের লগে আর কথা কইও না। মাইয়া মাইন্‌ষের জীবন অত কি সস্তা নিকি?

পারুল চমকে উঠেছিল। এই সময়েই খোলা জানালায় চোখে পড়ল কুয়াশা। পাকিয়ে পাকিয়ে যেন ঘরে ঢুকতে শুরু করবে এবার।

পারুল দ্রুত এগিয়ে যায়, জানলাগুলি বন্ধ কইর‍্যা দিয়া আসি বাবা। কুয়াশ লাইগ্যা গেছে—

লাগছে?

হ।

তইলে যাও।

পারুল বেরিয়ে যায়। প্রথমে জানালার পাল্লাগুলো পরে নিত্যপদর ঘরের দরজাটা টেনে বন্ধ করেই সে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। আর দাঁড়াতেই পাকানো কুয়াশা আকাশ থেকে নেমে এসে ঘুরতে ঘুরতে গাছপালা আর বাড়িঘরকে

যেন গিলে নিচ্ছে। কিন্তু এই কুয়াশায় কি দেখা যাবে কিছু? নাকি বেলা না পড়লে....

বারান্দা ছেড়ে নীচেই নেমে আসে পারুল। এরপর আকাশের দিকে তাকায়।

আকাশে এখন রোদ নেই। তবে একটু আগের নীল আকাশটা ঢেকে গেছে যেন হালকা একটা দুধের সরে। পারুল চোখ নামায়। নামাতেই আর দেখে না সে কিছু। তার সামনের রাস্তা, রাস্তা ছেড়ে ঘরবাড়ি, বাড়ির সীমানা, রাঙচিতার বেড়া সবই যেন ডুবে যাছে কোন কালের অতলে। পারুল পেছনে ফেরে। পায়ে পায়ে সামান্য এগিয়ে যায়। আর এগোতেই দেখে তাদের ঘরের পেছনের বাঁশবাগান, অদূরের তাল নারকেল আর তারই ভেতরের দীঘিটা এখন আর নেই। সবই উড়ো কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে। ঢাকতেই পারুল এগোয়। এগিয়েই আবার বারান্দায় ওঠে। তারপর চটপট ঘরের দরজাটা খোলে। আস্তে করে খুলেই এগিয়ে যায়। পেছনের দিকে।

কিন্তু এগোতেই অবাক।

পেছনের খুপরি ঘরটায় মানুষটা নেই। মানুষটার থলেও নেই। নেই কেন?

পারুল এদিকে ওদিকে তাকায়। তাকিয়েই ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পাগলের মতো দৌড়ায়।

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে গিয়ে পেছনের দিকের যে দরজাটা, পারুল সেদিকেই দৌড়ে যায়। কিন্তু দৌড়ে গিয়েই আচমকা থমকে দাঁড়ায়। দরজাটা ভেজানো, খিল লাগানো নেই।

বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে পারুলের। মুহূর্তেই সে দরজাটা খুলেই বেরিয়ে আসে। বেরিয়েই বাঁশবাগানে নেমে পাগলের মতো দৌড়াতে থাকে।

কিন্তু শুকনো পাতা, বাঁশের কোঁড় আর সরু সরু কঞ্চির বাধায় সে দৌড়াতে চাইলেও পারে না। সামান্য এগিয়েই থমকে দাঁড়ায়। এরপর আন্দাজেই এগোয়।

এগোলে হবে কী, চারদিকেই কুয়াশা। সামনে কিছুই দেখা যায় না। এগোলে শুধু পায়ের তলায় শুকনো পাতার শব্দই হয়। যদি উপায় থাকত চেঁচিয়ে নাম ধরেই ডাকত পারুল। কিন্তু তার উপায় নেই। তবু এগোল পারুল। আর এগোতে এগোতেই একসময় বাঁশবাগানও শেষ। বাঁশবাগান পার হয়ে ওদিকে জঙ্গল। এরপর আরও কিছুটা এগিয়ে নাকি সেই গাছটাকে পাওয়া যাবে। গাছটা কি এপারে, না ওপারে? নাকি তারও কোনও দেশ নেই! বর্ডারকেই সে শুধু পাহাড়া দিচ্ছে।

তাকিয়ে তাকিয়ে খুঁজলেও ঘন কুয়াশায় গাছটাকে আবিষ্কার করতে পারল না পারুল। মানুষটা বলেছিল, কুয়াশা থাকলে আজ রাতের মতো সেই গাছেও উঠে অপেক্ষা করতে পারে সে। সে কি তবে সেখানে পৌঁছে গেছে? কিন্তু

কখন গেল! আর যাবে তো ঠিকই আছে, তবে পারুলকে এভাবে না জানিয়ে কেন কেন? সে তো বলেই ছিল, অপেক্ষা করতে। কুয়াশা লাগলে নিজেই সে খুলে দিত দরজাটা! কিন্তু এভাবে না বলে... তবে কি ভেবেছিল পারুল তাকে বাধা দেবে! যেতে দেবে না তাকে? পারুলের তাতে বয়েই গেছে। সে কেন আটকাবে মানুষটাকে। মানুষটা তার কে!

বুকের ভেতর থেকে কী যেন একটা মুচড়ে উঠে আসছিল পারুলের। পারুল আর দাঁড়াল না। পেছনে ফিরে যেমন এসেছিল তেমনই আবার ফিরতে লাগল। এইটুকু পর্যন্তই তার জানা। এরপর আর ওদিকে কী আছে জানে না পারুল। তার এই সাত বছরের বিবাহিত সংসারজীবনে স্বজন তাকে এইটুকুই সীমানা দিয়েছে। এই সীমানার বাইরে তাই জগতটা একদম অচেনাই রয়ে গেছে পারুলের।

দলা পাকিয়ে পাকিয়ে কী একটা উঠে আসছিল। পারুল দ্রুত পা ফেলল। পরে বিনবিনে মশা আর গাঢ় হিমকণার মধ্যে বাঁশবাগানটা পার হয়ে আবার একসময় পেছনের দরজায় এসে দাঁড়ায় পারুল। পা ধুয়ে ঘরে ঢোকে। সন্ধে দেয়। শ্বশুরকে গরম দুধও খাইয়ে আসে। ক্রমে রাত বাড়ে। রাত আরও গভীর হয়। দূরে জঙ্গলে শেয়ালের ডাক শোনা যায়। পরে গুলি। সীমান্তে আজও গুলি বিনিময় চলে। এবং এভাবেই একসময় ভোর হয়। ভোর হলে কী মনে হওয়ায় এ দুদিনের অভ্যেস মতো পারুল পায়ে পায়ে পেছনের সেই খুপরি ঘরটায় ঢোকে। জানালার ছিদ্রপথে একবার বাইরে উঁকি মারে। কিন্তু কুয়াশা না-কাটায় কিছুই আর দেখা যায় না। এমনকি সেই গাছটাও নয়।

পারুল চোখ নামিয়ে নেয়। আর নিতেই কী দেখে চমকে ওঠে।

কাল অন্ধকার থাকায় আর চোখে পড়েনি। এখন পড়তেই সে অবাক। তক্তাপোশের একপাশে একটা কাঁচা মাটির পুতুল। পুতুল নয়। মূর্তিই বলা যায়। পারুল ঝুঁকে পড়ে। আর ঝুঁকতেই সে চমকে ওঠে। এ কী?

হাত বাড়িয়ে মূর্তিটা তুলতে গিয়েই পারুল আবিষ্কার করে নিজেকে। কোমরে গোজা শাড়ি আর মুখ আকাশের দিকে। কিন্তু দু হাত বাড়ানো। আর সেই বাড়ানো হাতের মুঠোয় একটি পাখি। উড়ে যাওয়ার অপেক্ষায়।

দেখছিল পারুল। কিন্তু দেখতে দেখতে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। গত বিকেল থেকেই বুকের ভেতরের যে দলাপাকানো অস্বস্তিটা দুমড়ে মুচড়ে গলার কাছাকাছি উঠে আসছিল, এই মুহূর্তে তা যেন বাইরে আসার রাস্তা পেয়েই উপচে পড়ল। পড়তেই পারুল ভাঙল কান্নায়। ফুলে ফুলে তক্তাপোশের একপাশেই সে কান্নায় গড়িয়ে পড়ল।